পাইল্‌স, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ও ক্যান্সার

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক

এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারী), এফআইসিএস

সম্পাদনা ঃ ডাঃ সজল আশফাক

অনুপম প্রকাশনী

উৎসর্গ ঃ

আব্বা, আলহাজ্ব মৌলভী রশীদ আহমেদ
আম্মা, মিসেস মরিয়ম রশীদ
ও
স্ত্রী, মিসেস শাহীন মাহবুবা হক
দুই ছেলে, ডাঃ আসিফ আলমাস হক
ও
সাকিব সারওয়াত হক
যারা আমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয়।

পারিবারিক পরিচিতিঃ

পিতাঃ মরহুম মৌলভী রশীদ আহ্‌মেদ

মাতাঃ মরহুমা মরিয়ম রশীদ

স্ত্রী ঃ মিসেস শাহীন মাহবুবা হক

প্রাক্তন লেকচারার, ইংলিশ,

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়;

প্রাক্তন ইংলিশ নিউজ পাঠিকা,

বাংলাদেশ টেলিভিশন।

পুত্র ঃ ১। ডাঃ আসিফ আলমাস হক
এমবিবিএস,
স্যার সলিমুল-াহ্‌ মেডিকেল কলেজ।

২। সাকিব সারওয়াত হক
এমবিবিএস, স্টুডেন্ট,
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ গাজিপুরা, থানাঃ মির্জাগঞ্জ, জিলাঃ পটুয়াখালী।

মুখবন্ধ

পেটের পীড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস এগুলি অতি সাধারণ একটি রোগ। জীবনে কোন না কোন সময় এ জাতীয় সমস্যায় ভোগেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুস্কর। পায়ুপথের রোগ যেমন পাইলস, ফিস্টুলা, এনাল ফিশার, ক্যান্সারে ভুগছেন এমন রোগীর সংখ্যা অনেক। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা এই যে এ রোগগুলো সম্পর্কে জনসাধারনের ধারণা অস্বচ্ছ, কখনও ভ্রান্ড় আবার কখনও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। এ কারণে এ রোগে হাতুড়ে চিকিৎসার প্রসার লক্ষনীয়। প্রচলিত ধারণা এই যে পাইলস বা ফিস্টুলা অপারেশন করলে আবার হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক কতৃক লিখিত 'পাইল্‌স, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ও ক্যান্সার' বইটি পড়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। সহজ, সরল ভাষায় লিখিত বইটি সর্বসাধারণের বোধগম্য করে লেখা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ বইটি পড়ে পাইলস সম্পর্কে সবার ভ্রান্ড় ধারণা ও কুসংস্কারের অবসান হবে। গণসচেতনতা বাড়াতে অধ্যাপক ডাঃ হকের প্রয়াসকে আমি আন্ড়রিকভাবে মোবারকবাদ জানাই।

অধ্যাপক ডাঃ এম, এ, হাদী
ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভারসিটি
শাহবাগ, ঢাকা।
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্স
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

লেখকের কথা

পাইলস বা অর্শ রোগের নাম জানেনা এরূপ লোক খুব কম আছেন। সর্ব সাধারনের ধারনা মলদ্বারের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে তার পাইলস হয়েছে। ছোটবেলা বিভিন্ন শহর, গ্রামে গঞ্জে দেখেছি "অর্শ, ভগন্দর ও গেজ চিকিৎসালয়"। জানতাম মলদ্বারের সমস্ড় রোগ কৃমির বাসা থেকে উৎপত্তি। এমবিবিএস পড়তে এসে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানার্জন হলো। এফসিপিএস পড়বার সময় এসব জ্ঞান আরও কিছুটা সমৃদ্ধ হলো। কিন্তু তারপরও পুরো বিষয়টি সম্পর্কে কৌতুহল মিটল না। রোগীদের দেখেছি অপারেশনের ভয়ে রাত্রে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ যুগ যুগ ভুগেও অপারেশন করছেন না রোগটি আবার হবে এই ভয়ে। অনেক রোগীকে দেখেছি উচ্চবিত্ত না হওয়া সত্বেও পাইলস অপারেশনের জন্য বিদেশ যাচ্ছেন। কারন একটিই আর তা হলো এত কষ্ট করে অপারেশন করবো কিন্তু যদি আবার হয়? তারচেয়ে বিদেশে গিয়ে একবার কষ্ট করি। কোন রোগী ভাবছেন এটি একটি গোপন রোগ, কেউ ভাবছেন যৌন রোগ, কেউ ভাবছেন নিশ্চয়ই কোন পাপের ফল, কেউ ভাবছেন এরোগের অপারেশন না করাই ভাল কারন আবারতো হবেই তাই কোনরূপ ঔষধ পথ্য খেয়ে যতদিন চালানো যায় তাই উত্তম।

এহেন প্রেক্ষাপটে ১৯৯৪ সনে সিংগাপুরে বৃহদন্ত্র, রেকটাম ও মলদ্বার সার্জারীর উপর প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়। ১৯৯৬ সনের জুলাই-এ দেশে ফিরে পাইলস, ফিষ্টুলা, এনাল ফিশার, পায়ুপথ ক্যান্সার এসব নিয়ে কাজ করতে থাকি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করি। ফিষ্টুলা (ভগন্দর) রোগীদের দেখেছি দুই থেকে ছয়-সাতবার পর্যন্ড় দেশে, বিদেশে অপারেশন করিয়েছেন এমনকি ভাল হওয়ার জন্য পেটে মলত্যাগের বিকল্প পথ করা হয়েছে। কিন্তু রোগ ভাল হয়নি। দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র হাতুরে চিকিৎসকদের দ্বারা মলদ্বারের অপূরনীয় ক্ষতি হতে দেখেছি। দেশে কোয়ালিফাইড চিকিৎসকের অভাব ও বিশাল জনগোষ্ঠীর কারনে এমনটি হয়েছে।

খাদ্যনালীর নিচের অংশ অর্থাৎ বৃহদন্ত্র, রেকটাম ও মলদ্বার মানুষের দেহে একটি বিশেষ ধরনের অংগ যেখানে বিশেষধরনের রোগ হয়। একজন চিকিৎসক যিনি শরীরের অন্যান্য অংগের চিকিৎসা করেন তার পক্ষে এই বিশেষ ধরনের রোগের জন্য তীক্ষ্ণ নজর দেয়া সম্ভব নয়। এ কারনে ১৮৩৫ সনে অর্থাৎ আজ থেকে ১৬৫ বৎসর পূর্বে লন্ডনের কেন্দ্রে একটি আলাদা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার নাম সেন্ট মার্কস হসপিটাল ফর দ্য ডিজিজেস অব কোলন (বৃহদন্ত্র) এন্ড রেকটাম (মলাশয় ও মলদ্বার)। কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য রোগী থাকা সত্বেও কলোরেকটাল ইন্সটিটিউট বা পৃথক হাসপাতাল অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এসব বিবেচনা করে বিগত দশ বৎসর যাবত আমার সামগ্রিক কর্মকান্ড শুধুমাত্র বৃহদন্ত্র, রেকটাম ও মলদ্বারের বিভিন্ন রোগের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছি যাতে রোগীদের উন্নততর ভাবে সেবা করতে পারি। আমার কাজের মাধ্যমে কোন সম্মানিত রোগী যদি উপকৃত হন তবে আমার জীবন ধন্য মনে করব। আপনারা জেনে খুশি হবেন এই প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরিচালনায় কলোরেকটাল সার্জারী একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে।

অসংখ্য সূধী ও সম্মানিত রোগীদের আগ্রহ আমাকে এই বই লিখতে উৎসাহ যুগিয়েছে। এই বইয়ে যদি কোন ভুলভ্রান্ড়ি থাকে তার জন্য মার্জনা করবেন। আপনাদের যে কোন ধরনের মূল্যবান উপদেশ বা সমালোচনা আমার চলার পথের পাথেয় হবে।

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস
বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ
ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারী (সিংগাপুর)
ইন্টারন্যশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারী (যুক্তরাষ্ট্র)
অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, কলোরেকটাল সার্জারী
বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এ লেখার পিছনে অনেকের অপরিসীম অবদান রয়েছে। প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে আমি যাদের কাছে ঋণী তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডাঃ এম.এ.হাদী, মাননীয় উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রসুল, অধ্যাপক ডাঃ আবু আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক ডাঃ এ.এন.এম. আতাই রাব্বি, অধ্যাপক ডাঃ আজাদ খান, অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক ডাঃ মবিন খান প্রমুখ, শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম.আর খানের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ডাঃ একেএম আজিজুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, এনেস্থেশিয়া বিভাগ ও অধ্যাপক ডাঃ এজেডএম জাহিদ, অধ্যাপক, ইউরোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর কাছে, তাদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরনার জন্য।

সাংবাদিকদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, জনাব গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল, জনাব তোয়াব খান, সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ, জনাব রাহাত খান, সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, জনাব এম মতিউর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো, জনাব এ.এম.এম বাহাউদ্দিন, সম্পাদক, দৈনকি ইনকিলাব। ইত্তেফাকের সিনিয়র ষ্টাফ রিপোর্টার জনাব ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলামের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী এই বই লেখার অনুপ্রেরনার জন্য।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মৌলভী রশীদ আহমেদ যিনি শিক্ষার জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তার নৈতিকতা ও আদর্শ আমার চলার পথের পাথেয়। আর আমার পরমা শ্রদ্ধেয়া স্নেহময়ী মাতা মিসেস মরিয়ম রশীদ-এর অক্লান্ড় পরিশ্রম আর সঠিক পরিচর্যা ও দিক নির্দেশনা আজ আমাকে এতদূর উঠে আসতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমার বড় ভাই অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান ও জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজের নিকট আমি অত্যধিক ঋণী তাদের সার্বিক অনুপ্রেরণার জন্য। আমি ভীষণভাবে ঋণী আমার সহধর্মিনী মিসেস শাহীন মাহবুবা হক, দুই পুত্র আসিফ আলমাস হক ও সাকিব সারওয়াত হকের কাছে যাদের অপরিসীম ত্যাগ ও সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এ বই লেখা সম্ভব হতনা।

এই বই লিখতে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ জওয়াহের জাহান কবির, ডাঃ এস এম শমশের নাহিদ ও ডাঃ নাজমুল হক মাসুম ও আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী জনাব আব্দুল হালিম আমি কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যারা অশেষ কষ্ট করে আমাকে চিকিৎসক হিসাবে তৈরী করেছেন।

সূচিপত্র ঃ

পেপটিক আলসার বা গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগ
পাকস্থলীর ক্যান্সার
অ্যাপেনডিসাইটিস
মলদ্বার ও কোলনের প্রধান প্রধান কয়েকটি রোগের উপসর্গ
পাইলস বা অর্শ: রহস্যাবৃত একটি স্বাস্থ্য সমস্যা
ঔষধ ও পথ্যের সাহায্যে পাইলস চিকিৎসা
বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসা: রিং লাইগেশন পদ্ধতি
পাইলস রোগে হাতুড়ে চিকিৎসার পরিণতি
পাইলস কি অপারেশন করলে আবারো হয়?
পাইলস কি একটি গোপন রোগ?
পাইলসের আধুনিক চিকিৎসা
শিশুর পাইলস সমস্যা
গর্ভবতী মায়ের পাইলস চিকিৎসা
লিভার সিরোসিসেরর রোগীদের কি পাইলস বেশী হয়?
হার্টের রোগীর পাইলস
রিংলাইগেশন পদ্ধতি: বিনা অপারেশনে ৮০% পাইলস চিকিৎসা
পাইলস চিকিৎসায় লেজার সার্জারী
ইনজেকশন পদ্ধতি: বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসা
মলদ্বার না কেটে অত্যাধুনিক পাইলস অপারেশনের বিস্ময়কর প্রযুক্তি - লংগো অপারেশন
চিকিৎসকের দৃষ্টিতে: পাইলস, ফিষ্টুলা না ক্যান্সার?
মলদ্বারের ব্যথা ও এনাল ফিশার: এই গোপন কষ্টের আধুনিক চিকিৎসা
মলদ্বারের ব্যথা ও এনাল ফিশারের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা
ফিস্টুলা নিয়ে কিছু কথা
পায়ুপথের আরেক সমস্যা ফিস্টুলা বা ভগন্দর
অপারেশনের পর আবার ফিস্টুলা হওয়াই কি নিয়ম?
একজন ফিস্টুলা রোগীর কেসহিষ্ট্রি
রেকটাল প্রোল্যাপ্স: মলদ্বার বেরিয়ে আসা বা আলিশ রোগ
মলদ্বারে চুলকানি ও তার প্রতিকার
অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি: মলদ্বার না কেটে রেকটাম ক্যান্সার অপারেশন
পায়ুপথ ক্যান্সার: মলত্যাগের বিকল্পপথ কতটা জর"রি
রেকটাম ক্যান্সার: কেস হিস্ট্রি ও স্ট্যাপলিং চিকিৎসা
পায়ুপথ বা রেকটাম ক্যান্সার চিকিৎসা
ক্রনিক আমাশয় বা আইবিএস (ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম)
কোষ্ঠকাঠিন্য: আড়ালে মারাত্মক ব্যাধিও থাকতে পারে
আলসারেটিভ কোলাইটিস: কখন অপারেশন প্রয়োজন
পাইলোনিডাল সাইনাস(দুই নিতম্বের মাঝখানে নালী)
কলোষ্টমী(বিভিন্ন রোগে পেটে মলত্যাগের বিকল্প পথ বা মলত্যাগের ব্যাগ লাগানো)
কলোষ্টমী পরিচর্যা - ইরিগেশন পদ্ধতি
মলদ্বার ও যৌন রোগ
এনাল ইনকনটিনেন্স (**Anal incontinence;** মল বা বায়ু ধরে রাখতে না পারা)
মলদ্বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
পাইলস চিকিৎসা নিয়ে প্রতারনা
বিভিন্ন ধরনের এক্সরে
পাইলস, ফিস্টুলা, এনাল ফিশার ও ক্যান্সার চিকিৎসায় সফলতা
আলোকচিত্র

পেপটিক আলসার বা গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগ

গ্যাস্ট্রিক বা আলসার নামটির সাথে পরিচিত নন এমন লোক খুঁজে বের করা হয়তো খুব কঠিন হবে। সাধারণত লোকজন গ্যাস্ট্রিক বা আলসার বলতে যা বুঝিয়ে থাকেন আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলি পেপটিক আলসার।

পেপটিক আলসার যে শুধু মাত্র পাকস্থলীতেই হয়ে থাকে তা কিন্তু নয় বরং এটি পৌষ্ঠিক তন্ত্রের যে কোন অংশেই হতে পারে। সাধারণত পৌষ্ঠিক তন্ত্রের যে যে অংশে পেপটিক আলসার দেখা যায় সে গুলো হচ্ছে -

১. অন্ননালীর নিচের প্রান্ড়
২. পাকস্থলী;
৩. ডিওডেনামের বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ এবং
৪. পৌষ্ঠিক তন্ত্রের অপারেশনের পর যে অংশে জোড়া লাগানো হয় সে অংশে। পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশ তথা আমাদের এ উপমহাদেশে এ রোগীর সংখ্যা খুবই বেশী। ধনীদের চেয়ে গরীব লোকদের মধ্যে এ রোগ বেশী দেখা দেয়। তবে নারী পুর"ষ প্রায় সমান ভাবে এ রোগে আক্রান্ড় হতে পারেন।

যে সব কারনে পেপটিক আলসার হতে পারে -

- বংশগত ঃ কারো নিকটতম আত্মীয় স্বজন যেমনঃ মা, বাবা, চাচা, মামা, খালা, ফুফু যদি এ রোগে ভুগে থাকেন তবে তাদের পেপটিক আলসার হবার ঝুকি বেশী থাকে। যাদের রক্তের গ্র"প "ও" তাদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশী।
- রোগ-জীবানু ঃ হেলিকো বেক্টার পাইলোরি নামক এক প্রকার অণুজীব এ রোগের জন্য বহুলাংশে দায়ী।
- ঔষধ ঃ যে সমস্ড় ঔষধ সেবনে পেপটিক আলসার হতে পারে তন্মধ্যে ব্যাথা নাশক ঔষধ বা N SAIDS বিশেষ ভাবে উলে- খ যোগ্য।
- ধুমপান ঃ ধুমপায়ীদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা বেশী।

এ ছাড়াও কারো পৌষ্ঠিকতন্ত্র থেকে যদি বেশী পরিমানে এসিড এবং প্রোটিন পরিপাককারী এক ধরনের এনজাইম যা পেপসিন নামে পরিচিত তা নিঃসৃত হতে থাকে এবং জন্মগত ভাবেই পৌষ্ঠিকতন্ত্রের গঠনগত কাঠামো দূর্বল থাকে তাহলে ও পেপটিক আলসার হতে পারে।

তবে সাধারণত যে কথাটা প্রচলিত ভাজা-পোড়া কিংবা ঝাল জাতীয় খাবার খেলে পেপটিক আলসার হয় এর কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেলেনি। তবে যারা নিয়মিত আহার গ্রহণ করেন না কিংবা দীর্ঘ সময় উপোস থাকেন তাদের মধ্যে পেপটিক আলসার দেখা দিতে পারে।

উপসর্গ সমূহঃ

- পেটে ব্যাথা ঃ সাধারণত পেটের উপরি ভাগের মাঝখানে বক্ষ পিঞ্জরের ঠিক নিচে পেটিক আলসারের ব্যাথা অনুভব হয়। তবে কখনো কখনো ব্যাথাটা পেছনের দিকেও যেতে পারে।

- ক্ষুধার্ত থাকলে ব্যাথা ঃ এ জাতীয় রোগী ক্ষুধার্ত হলেই প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে এবং খাবার খেলে সাথে সাথে ব্যথা কমে যায়।
- রাতে ব্যাথা ঃ অনেক সময় রাতের বেলা পেটে ব্যাথার কারনে রোগী ঘুম থেকে জেগে উঠে কিছু খেলে ব্যাথা কমে যায় এবং রোগী আবার ঘুমিয়ে পরে।
- মাঝে মধ্যে ব্যাথা ঃ পেপটিক আলসারের ব্যথা সাধারণত সব সময় থাকেনা, একাধারে ব্যাথাটা কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকে তারপর রোগী সম্পূর্ণ রূপে ভাল হয়ে যায়, এ অবস্থা কয়েকমাস থাকে তারপর আবার কয়েক সপ্তাহ ধরে ঠিক আগের মতো ব্যাথা অনুভব হয়।
- ব্যথা কমে ঃ পেপটিক আলসার ব্যাথা সাধারণত দুধ, এন্টাসিড, খাবার খেলে কিংবা বমি করলে অথবা ঢেকুর তুললে ব্যাথা কমে।

এ ছাড়াও পেপটিক আলসারের রোগীদের মধ্যে বুক জ্বালা, অরুচি, বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দা, কিংবা হঠাৎ করে রক্ত বমি অথবা পেটে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

- শৃংখলা ঃ পেপটিক আলসারে আক্রান্ড় রোগীদের অবশ্যই ধুমপান বন্ধ করতে হবে। ব্যাথা নাশক ঔষধ অর্থাৎ এসপ্রিন জাতীয় ঔষধ সেবন থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে এবং নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- ঔষধ ঃ পেপটিক আলসারের রোগীরা সাধারণত এন্টাসিড, রেনিটিডিন, ফেমোটিডিন, ওমিপ্রাজল, লেনসো প্রাজল, পেনটো প্রাজল জাতীয় ঔষধ সেবনে উপকৃত হন।
- কারণ ভিত্তিক চিকিৎসা ঃ জীবানু জনিত কারনে যদি এ রোগ হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় যা ট্রিপল থেকে থেরাপী নামে পরিচিত।
- অপারেশন ঃ পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে অপারেশন সাধারণত জরুরী নয়। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ঔষধ সেবনের পরও যদি রোগী ভাল না হন, কিছু খেলে যদি বমি হয়ে যায় অর্থাৎ পৌষ্ঠিক নালীর কোন অংশ যদি সরু হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অপারেশন করিয়ে রোগী উপকৃত হতে পারেন।

সময় মত পেপটিক আলসারের চিকিৎসা না করলে রোগীর নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। যেমন ঃ

১. পাকস্থলী ফুটা হয়ে যেতে পারে;
২. রক্ত বমি হতে পারে;
৩. কালো পায়খানা হতে পারে;
৪. রক্ত শূণ্যতা হতে পারে;
৫. ক্যান্সার হতে পারে (কদাচিৎ) এবং
৬. পৌষ্টিক নালীর পথ সরু হয়ে যেতে পারে এবং রোগীর বার বার বমি হতে পারে।

কাজেই যারা দীর্ঘ মেয়াদী পেপটিক আলসারে ভুগছেন তাদের উচিৎ চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়া। পেপটিক আলসার জনিত জটিলতা আগে থেকেই সনাক্ত করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা নেয়া, প্রয়োজনে অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা ধরে না রেখে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপন করা।

পাকস্থলীর ক্যান্সার

যে সব ক্যান্সারের কারনে মানুষ মারা যায় তন্মধ্যে পাকস্থলীর ক্যান্সার অন্যতম। তবে আশার কথা হল এই যে - এ রোগটি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা গেলে এবং অপারেশনের মাধ্যমে ক্যান্সারের আক্রান্ড় স্থান ফেলে দিলে রোগী সম্পূর্ণ রূপে ভাল থাকতে পারেন।

প্রাথমিক অবস্থায় হজম ক্রিয়ার গোলযোগ বা সচরাচর খাদ্য গ্রহনের পাকাশয়ের প্রান্ড়ভাগে অস্বস্ড়ি অনুভুতি বা **Dyspepsia** ছাড়া তেমন কোন উপসর্গ দেখা যায় না। এর ফলে রোগী তেমন কোন গুর"ত্ব দেন না, অনেকে মনে করেন গ্যাষ্ট্রিক হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ খেয়ে অনেকে সাময়িক আরাম অনুভব করেন। ফলে ক্যান্সার পাকস্থলী থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পরার সুযোগ পায়। রোগটি ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যায় -

১. অল্প খেলেই তৃপ্তি চলে আসে;
২. পেট ফেপে থাকে;
৩. পেট ফুলে যায়;
৪. বমি হয়;
৫. রক্ত শূণ্যতা দেখা যায়;
৬. খাদ্য গ্রহনে অন্ননালীতে ব্যাথা অনুভব হয়;
৭. শরীরের ওজন কমে যায়;
৮. বমির সাথে রক্ত যায় কিংবা কালো পায়খানা হতে পারে।

সে ক্ষেত্রে অপারেশন করিয়েও রোগীর আয়ুষ্কাল খুব বেশী বাড়ানো যায় না।

এ রোগটি সাধাণত চলিশোর্ধ বয়সেই বেশী হয়ে থাকে। নারীদের চেয়ে পুর"ষেরা এ রোগে বেশী আক্রান্ড় হন।

যে সমস্ড় কারণে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয় তন্মধ্যে উলে- খযোগ্য হচ্ছে -

১. হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি নামক এক প্রকার জীবানুর আক্রমন;
২. প্রচুর পরিমানে মদ্যপান;
৩. যে সমস্ড় খাবারে অত্যধিক লবণ রয়েছে যেমন ঃ কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছ দীর্ঘ দিন যাবৎ সংরক্ষিত টিনজাত খাবার;
৪. যে সমস্ড় খাবারে **N-nitrous compounds** রয়েছে কিংবা এন্টি অক্সিডেন্ট এর অভাব রয়েছে।

ধুমপায়ী লোক এবং যে পরিবেশে ডাস্ট বা ধুলাবালী বেশী সেখানে বসবাসকারীদের মধ্যে এ রোগ হতে পারে। কেউ কেউ মনে করে বংশগত কারণেও পাকস্থলীর ক্যান্সার হতে পারে।

পূর্বে জাপানে পাকস্থলী ক্যান্সারের কারণে বহুলোক মারা যেত। কিন্তু বর্তমানে চলিশোর্ধ বয়সের যে লোক হজম ক্রিয়ার গোলযোগে আক্রান্ড় হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি করে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করে ক্যান্সার অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এবং রোগী বাকী জীবন যাপন করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের দেশে রোগীরা যখন ডাক্তারের শরনাপন্ন হন - তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যান্সার পাকস্থলীর বাইরে ছড়িয়ে পরে। প্রাথমিক অবস্থায় পাকস্থলীর ক্যান্সার নির্ণয় করা গেলে অপারেশনের মাধ্যমে এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া যায়।

অ্যাপেনডিসাইটিস

তলপেটে হঠাৎ করে ব্যথা উঠলেই অনেকে মনে করে থাকেন অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা। জর"রী ভিত্তিতে অপারেশন দরকার। আসলে কথাটা সঠিক নয়। পেটে ব্যথা অ্যাপেনডিসাইটিস ছাড়াও বহুবিধ কারনে হতে পারে। ঔষধ পত্রের মাধ্যমেও পেটের ব্যথা থেকে নিরাময় হওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে।

অ্যাপেনডিক্স হচ্ছে ছোট নলাকার একটি অংগ যা বৃহদন্ত্র (Colon) এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। লম্বায় ২ - ২০ সে.মি.। কোন কারণে অ্যাপেনডিক্সের মধ্যে ইনফেকশন হলে এটি ফুলে যায়, প্রদাহ হয়, তখন একে বলা হয় অ্যাপেনডিসাইটিস।

উপসর্গ সমূহ ঃ

১. সাধারণত প্রথমে ব্যথা নাভীর চারপাশে অনুভব হয় এবং কয়েক ঘন্টা পর ব্যাথাটা তল পেটের ডান পাশে চলে আসে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পেটের অন্য অংশেও ব্যাথা হতে পারে;
২. বমি বমি ভাব হতে পারে;
৩. বমিও হতে পারে;
৪. অর"চি হতে পারে;
৫. পাতলা পায়খানা হতে পারে এবং
৬. জ্বর হতে পারে।

এ রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের রোগীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বেশী জর"রী। আলট্রাসনোগ্রাম কিংবা রক্ত পরীক্ষা অ্যাপেনডিসাইটিস নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে। তবে এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাই গুর"ত্বপূর্ণ। পেটের ডানদিকে নিচের অংশে অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। তাই এ রোগে অপারেশনের আগে চিকিৎসককে অবশ্যই অন্যান্য কারণগুলো ক্ষতিয়ে দেখতে হবে। তবে অ্যাপেনডিসাইটিস হলে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। কারো অ্যাপেনডিসাইটিস হলে যদি অপারেশন করা না হয় তাহলে অ্যাপেনডিক্স ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, ইনফেকশন সমস্ড় পেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং জীবন বিপন্ন হতে পারে।

মলদ্বার ও কোলনের প্রধান প্রধান কয়েকটি রোগের উপসর্গ

- পাইলস্ ঃ

রক্তপড়া (তাজা এবং অনেক সময় ফিনকি দিয়ে বের হয়ে আসা) মাঝে মাঝে রক্তপড়া, সাধারণত ব্যাথা থাকেনা, মাংসপিন্ড ঝুলে পড়া, অনেক সময় শুধু মাংস ঝুলে পড়ে এবং চুলকানি হয়।

- এনাল ফিশার ঃ

মল ত্যাগে প্রচন্ড ব্যথা, জ্বালা যন্ত্রনা, পায়খানা গায়ে লেগে রক্ত যাওয়া বা টিস্যু পেপারে রক্ত দেখা এবং হাতে গেজের মত লাগা।

- ফিস্টুলা ঃ

মাঝে মাঝে ব্যাথা হওয়া, ফুলে যাওয়া, পুঁজ রক্ত পড়া, হাতের মধ্যে শক্ত কিছু একটা লাগা।

- ক্যান্সারঃ
  - কোলনের ডান পাশে ক্যান্সার - পেটের ডান পাশে ও নীচে সাধারণত চাকা নিয়ে রোগীরা আসে। শারীরিক দুর্বলতা বেশী থাকে।
  - কোলনের বাম পাশে - হঠাৎ খাদ্যনালী বন্ধ হয়ে পেট ফোলা নিয়ে এই রোগীরা সাধারণত আসে। বাম পাশের নিচের দিকে হলে পায়খানার সাথে মিশানো রক্ত নিয়ে রোগীরা আসতে পারে। অনিয়মিত পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ নিয়েও রোগীরা আসে।
- রেকটাম ক্যান্সার ঃ

মল ত্যাগের সময় রক্তপড়া (পায়খানার সাথে মিশানো) মল ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, ঘনঘন মল ত্যাগ, সব সময় মল ত্যাগের ইচ্ছা এবং মলদ্বার খালি না হওয়া ইত্যাদি উপসর্গই প্রধান। তবে পুরাতন হলে মলদ্বারে ব্যথা, মাজার ব্যথা, পায়ে ব্যথা নিয়েও আসতে পারে।

- ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার ঃ

পেটে পানি, পেটে চাকা, জন্ডিস, শ্বাসকষ্ট, কাশি, হাতে-পায়ে ব্যথা, মাজার ব্যথা ও ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

পাইলস বা অর্শ রহস্যাবৃত একটি স্বাস্থ্য সমস্যা

পাইলস রোগটির সাথে আমরা হাজার বছর ধরে পরিচিত। কিন্তু এখনও পূরো বিষয়টি আমাদের কাছে অস্বচ্ছ, ভ্রান্ড়্ধারণায় পূর্ণ এবং সংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দী।

পাইলসের সংজ্ঞা ঃ পাইলসের কোন সঠিক সংজ্ঞা এখনও পর্যন্ড় চিকিৎসকদের জানা নেই। কারণ এ রোগটির আসল প্রকৃতি এখনও পর্যন্ড় পুরোপুরি বোধগম্য নয়। পাইলস বলতে আমরা বুঝি মলদ্বারের ভিতরে ফুলে ওঠা রক্তের শিরার একটি মাংসপি- । এ শিরাগুলোর উৎপত্তির ব্যাপারে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এরূপ রক্তের শিরার মাংসপি- বা ‘কুশন’ সব মানুষেরই রয়েছে। তাই প্রকৃত অর্থে পাইলস বা ‘হেমোরয়েড’ আমরা তখনই বলি যখন এটি কোনরূপ উপসর্গ সৃষ্টি করছে। যেমন মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়া মাংসপি- অথবা রক্ত যাওয়া। প্রতিটি মানুষের তিনটি পাইলস বা ‘কুশন’ আছে। বড় পাইলসের মাঝখানে ছোট ছোট পাইলসও থাকতে পারে। পায়খানা করার সময় শিরাগুলো কিছুটা ঝুলে পড়ে এবং রক্ত ভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে তারপর ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়।

বয়স ঃ ৩০-৬০ বৎসর বয়সের ভিতর এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ২০ বৎসর বয়সের নিচে পাইলস খুব একটা দেখা যায় না। পাইলস সনাক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক কেবল যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে পাইলস সনাক্ত করতে পারেন। কখনও কখনও টয়লেটে বসিয়ে কোত দিয়ে দেখতে হয়। আমাদের কাছে বিভিন্ন চিকিৎসক রোগী পাঠান পাইলস আছে বলে কিন্তু পরীক্ষা করে আমরা হয়ত পাই এনাল ফিশার, পলিপ অথবা ফিস্টুলা। অর্থাৎ মলদ্বারের যে কোন রোগকে সবাই পাইলস হিসাবে জানেন। কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। এ রোগ মহিলাদের চেয়ে পুর"ষের কিছুটা বেশি হয়। যুক্তরাষ্টের ৫০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যার ৫০% ভাগ কোন না কোন সময় পাইলসের সমস্যায় ভোগেন।

কারণ ঃ কয়েক শতাব্দীর গবেষণা সত্ত্বেও পাইলসের প্রকৃত কারণ উদঘাটিত হয়নি। তবে কিছু কিছু রোগ পাইলস হওয়াকে ত্বরান্বিত করে যেমন, মলত্যাগে অতিরিক্ত কোত দেওয়া, অনিয়মিত পায়খানার অভ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, ইত্যাদি। অন্য কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য পাইলস হতে পারে যেমনঃ বংশগত, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, অনেকক্ষণ গরমে থাকা, ভারী ওজন তোলা, গর্ভাবস্থা, আঁটসাঁট পোশাক পরা, হরমোনের প্রভাব, আঁশ জাতীয় খাবারের অভাব ইত্যাদি।

উপসর্গ ঃ পাইলসের শ্রেণীবিন্যাস ঃ পাইলস দুই প্রকার।

(১) বহিঃস্থিত পাইলস ঃ এ ক্ষেত্রে মলদ্বারের বাইরে ফোলা থাকে এবং কিছুটা ব্যথা বা অস্বস্ড়ি হতে পারে।

(২) অভ্যন্ড়রীণ পাইলস ঃ এ ক্ষেত্রে টয়লেটে টাটকা লাল রক্ত দেখা যায়। কোনরূপ ব্যথা থাকে না। মলত্যাগের শেষে রক্ত যায়। রক্ত ফোটায় ফোটায় যায় আবার কখনও তীরের বেগে যায়। রক্ত যাওয়ার পর যদি বেশি ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয় তাহলে এনাল ফিশার বা ক্যান্সার হতে পারে। রক্ত যেতে যেতে রোগী গভীর রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারেন। মলদ্বারের বাইরে পাইলসটি ঝুলে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে মলত্যাগের শেষে পাইলসটি আপনাআপনি ভিতরে ঢুকে যেতে পারে অথবা রোগী হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেন। যখন এটিকে চাপ দিয়ে ঢুকানো যায় না তখন একে চতুর্থ ডিগ্রী পাইলস বলে। রক্ত যাওয়া কখনও একটানা চলে না। প্রথমত বৎসরে একবার বা দু’বার যায় এরপর দু’মাস পরপর যায়। তারপর প্রতিমাসে যায়। শেষে ঘন ঘন রক্ত যায় এবং রক্ত যাওয়ার পরিমাণও বেড়ে যায়। যখন মরা রক্ত যায়

বা আমমিশ্রিত রক্ত যায় এবং পায়খানার শুর“তেই রক্ত যায় তখন আমরা ক্যান্সার বলে সন্দেহ করি। তবে পায়ুপথ বা বৃহদান্ত্রের ক্যান্সারে টাটকা লাল রক্ত যেতে পারে।

পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। থ্রম্বোসিস হলে বা পাইলস বাইরে অতিরিক্ত ঝুলে থাকলে ব্যাথা হতে পারে। সম্মানিত রোগীদের ধারণা শুধুমাত্র পাইলস হলেই রক্ত যায়। কিন্তু সঠিক তথ্য হচ্ছে পায়ুপথের অসংখ্য রোগের প্রধান লক্ষণ টয়লেটে রক্ত যাওয়া। যেসব রোগে টয়লেটে রক্ত যায় তার মধ্যে রয়েছে পাইলস, এনাল ফিশার, পলিপ, ক্যান্সার, ফিস্টুলা, আলসারেটিভ কোলাইটিস, রেকটাল প্রোলাপস। বিগত নয় বছর আমি বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথের সমস্যায় ভুগছেন এমন ২৯,৬৩৫ জন রোগীর উপর গবেষণা করে দেখেছি যে, এদের মধ্যে ১৮% পাইলস, ২% থ্রমবোসড পাইলস, ৩৫% এনাল ফিশার, ২.২% পাইলস, ফিস্টুলা, এনাল ফিশার একত্রে, ১৫% ফিস্টুলা, ২.৫৫% পায়ুপথ ক্যান্সার, ৩.৫% রেকটাল পলিপ, ২% মলদ্বারে ফোঁড়া, ১.৮৪% অজানা কারণে মলদ্বারে ব্যথা, ৬% ক্রনিক আমাশয় (আইবিএস), ০.৫% অজানা কারণে রক্ত যাওয়া, ০.২৫% অজানা কারণে মলদ্বারে চুলকানি রোগে ভুগছেন। এ গবেষণার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, মলদ্বারে শুধু পাইলস রোগই হয় না আরও অনেক রোগ হয় যার শতকরা বিশ ভাগ রোগী পাইলসে আক্রান্ড়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ প্রকটস্কপি ও সিগময়ডস্কপি পরীক্ষা করা অত্যন্ড় জর“রি। মলদ্বারের ভিতর এন্ডোস্কপি যন্ত্র দিয়ে এ পরীক্ষা ব্যতীত কখনও সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব নয়। আমরা বেশ কিছু রোগী পেয়েছি যাদের ফিস্টুলা অপারেশন হয়েছে। রোগীর কখনও রক্ত যায় না। অথচ এ পরীক্ষায় ক্যান্সার ধরা পড়েছে। আবার এমনও দেখেছি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইলস অপারেশন করে এসেছেন কিন্তু পাইলস সারছে না। পরীক্ষা করে দেখেছি ভিতরে ক্যান্সার আছে। রোগীর কোনই উপসর্গ নেই অথচ ক্যান্সার থাকতে পারে। কিছুদিন পূর্বে একজন রোগী সিংগাপুর থেকে ফিস্টুলা অপারেশন করে এসেছেন। তিনি ভাল হননি তাই দেখাতে এসেছেন। তার কোন রক্ত যাওয়ার সমস্যা নেই। আমরা র“টিন চেকআপ হিসাবে সিগময়ডস্কপি পরীক্ষা করে তার ক্যান্সার সনাক্ত করেছি।

প্রতিরোধের উপায় ঃ এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে সময়মত কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা, টয়লেটে বসে বসে পেপার/বই না পড়া, খাবারের সাথে আঁশ জাতীয় জিনিস যেমনঃ ফল, সব্জি, সালাদ পরিমাণমত খাওয়া, দৈনিক ৬-৮ গ-াস পানি পান করা, ভারী ওজন না তোলা, অতিরিক্ত গরমে বেশিক্ষণ না থাকা ইত্যাদি।

ঔষধ ও পথ্যের সাহায্যে পাইলস চিকিৎসা

মানুষের রোগ ব্যাধির মধ্যে মলদ্বারের রোগেই সবচেয়ে বেশী স্ব-চিকিৎসা এবং হাতুড়ে চিকিৎসা হয়। কিছুটা ভয় এবং বিব্রতকর অনুভূতির জন্য এজাতীয় রোগ হলে রোগীরা ডাক্তার দেখাতে চাননা। রোগীরা নিজে নিজে অথবা সম্ভ্রয় পাওয়া হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যান বেশী। বিভিন্ন কুসংস্কার এবং মলদ্বারের সব রোগই পাইলস এই ভ্রান্ড় ধারণার কারনে চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরী করেন যা কখনও কখনও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। হয় রোগটি শুর“ থেকেই ক্যান্সার অথবা অবহেলার কারনে ইতিমধ্যে সেখানে ক্যান্সার হয়ে গেছে।

পাইলসের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে টয়লেটে রক্ত যাওয়া, মাংসপি“ ঝুলে পড়া ও ব্যথা হওয়া। পাইলস যখন বাইরে ঝুলে পড়ে তখন শুধুমাত্র ঔষধের মাধ্যমে এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। যদি মাংশ পি“টি ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বিনা অপারেশনে রিং লাইগেশন পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা সম্ভব। আর যদি মাংশপি“টি ভিতরে ঢুকানো না যায় তাহলে অপারেশন করতে হবে। আবার পাইলসে ব্যথা হলে তার কারন হচ্ছে থ্রম্বসিস, পচনধরা (গ্যাংগ্রিন) বা ঘা হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অপারেশনই যথাযথ চিকিৎসা।

যখন টয়লেটে টাটকা লাল রক্ত যায় এবং বাইরে কোন বড় ধরনের মাংশপি“ ঝুলে না থাকে সেক্ষেত্রে ঔষধ ও পথ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে। তবে চিকিৎসককে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে কি কারনে রক্ত যাচ্ছে। বিশেষ করে পায়ুপথের ভিতর কোনরূপ ক্যান্সার আছে কি না।

যে রোগীরা পাইলসে ভোগেন তাদের সাধারণত কোষ্ঠকাঠিণ্য বা ডায়রিয়া জাতীয় সমস্যা থাকে। অনেক রোগী আছেন যাদের পেটে গ্যাস হয়। পায়খানার সাথে মিউকাস বা আম যায়। পায়খানা করার পর মনে হয় ক্লিয়ার হয়নি। দুধ, পোলাউ, ঝাল, গর“র মাংশ ইত্যাদি খেলে হজমে গোলমাল হয়। টয়লেটে অনেকক্ষন বসে থাকতে হয়। অনেকে মলদ্বারের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে মলত্যাগ করেন। রোগীরা এসমস্যাগুলোকে গ্যাষ্ট্রিক বা ক্রনিক আমাশয় হিসাবে মনে করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে আমরা বলি “ইরিটেবল বাওয়েল সি—াম” বা ‘আই.বি.এস’। এজাতীয় রোগীদের দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, পোলাউ, ঝাল, বিরিয়ানী খাওয়া নিষেধ।

উপদেশ ঃ

পাইলসে যে দুটি রোগ সবচেয়ে বেশী সমস্যা করে তা হলো কোষ্ঠকাঠিণ্য ও ডায়রিয়া। বেশীর ভাগ রোগীর খাদ্যাভ্যাসে ত্র“টি থাকে এবং মলদ্বার ভালভাবে পরিস্কার রাখেন না। যদি রোগীর নরম পায়খানা, চুলকানি ও সামান্য রক্ত যায় তাহলে তাকে আঁশ জাতীয় খাবার দেয়া যেতে পারে। ডায়রিয়া হয় এমন খাবার পরিহার করতে হবে। মলত্যাগের পর মলদ্বার ভালভাবে পানি দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

মলত্যাগের কু-অভ্যাস ত্যাগ ঃ

পাইলস রোগীদের তিনটি কু-অভ্যাস দেখা যায়। (১) যেভাবেই হোক প্রতিদিন অন্ড়ত একবার পায়খানা করতে হবেই। এটি না হলে তারা সারাদিন শারিরীক ও মানসিক টেনশনে ভোগেন। (২) সকাল বেলা প্রথমবার যখন মলত্যাগের বেগ হয় তখন তাতে সাড়া দেন না। (৩) পায়খানা ক্লিয়ার হয়নি ভেবে টয়লেটে

অনেকক্ষন বসে থাকেন এবং কোথ দেন যেন রেকটাম থেকে পায়খানা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস এই যে যদি সামান্য মল ভিতরে থেকে যায় তাহলে সারাদিন অস্বস্ড়িতে কাটাতে হবে।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঃ

আমরা প্রচুর রোগী পাই বিশেষ করে শিশুদের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে পায়ুপথের বিভিন্ন রোগ হয়। পায়খানার পরিমান বাড়ে এমন খাবার খাওয়া উচিত। যেমন শাক, সব্জি, সালাদ, ফল, ইসুপগুলের ভূষি, গমের ভূষি ইত্যাদি। দৈনিক পরিমিত পানীয় খেতে হবে। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য ৬-৮ গ-াস পানি প্রতিদিন পান করতে হবে। অনেক রোগীকে এসব উপদেশ দিলে তারা কদিন পরে ভুলে যান অথবা আবার ঐ চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কদিন আগে আবার খান যাতে তাকে বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমি ভূষি বা সালাদ খেয়েছি। ইসুপগুলের ভূষি দোকানে পাওয়া যায় আবার ঔষধ কোম্পানীও বানায়। এছাড়া আঁশ হিসাবে মিথাইল সেলুলেজ ট্যাবলেট ও পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী আশ জাতীয় খাবারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ডাঃ ওয়েবষ্টার (ইংল্যা—) ও ডাঃ মোয়েসগার্ড (ডেনমার্ক)।

পাইলসের ঔষধ ঃ

পাইলসের রক্ত বন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ব্যবহার হয়ে আসছে যেমন ট্রানেক্স ক্যাপসুল ১টি করে ২ বার ৫দিন অথবা এনারক্সিল ১টি করে তিনবার ৫দিন। সর্বশেষ যে ঔষধটি বাজারে এসেছে তার নাম ফ্লাভোনয়িক এসিড। এটির কার্যকারিতা নিয়ে এখন ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। প্রাথমিক পাইলসে এটি ভাল কাজ দেবে বলে আশা করা যায়। এটির সেবন মাত্র ১-২টি বড়ি দিনে ২ - ৩ বার। তবে ইতিমধ্যে দেখেছি ক্যান্সার রোগীও এটি খাচেছন পাইলস মনে করে। সম্মানিত রোগীদের প্রতি অনুরোধ দয়া করে কোনও চিকিৎসাই নিজে নিজে করবেন না।

মলদ্বারে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

পাইলসের সমস্যা এত বেশী যে বেশীর ভাগ রোগীই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা মলম লাগিয়ে থাকেন। এমনকি বাসার অন্য কারো কোন কারনে একটি অয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছিল সেটিই নিজে নিজে লাগাতে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের অয়েন্টমেন্ট ক্রীম, সাপোজিটরী, জেল বাজারে পাওয়া যায়। এসব ঔষধের ভিতর বিভিন্ন ধরনের ঔষধের সংমিশ্রন থাকে যেমন অবশকারী ঔষধ, ষ্টেরয়েড ও এন্টিসেপ্টিক। এসব ঔষধের ভিতর অবশকারী ঔষধটি ব্যথা ও চুলকানি কমাতে পারে কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে চামড়ায় এলার্জি হতে পারে। লোকাল এনেস্থেটিক ও ষ্টেরয়েড ঔষধের সংমিশ্রন মলদ্বারের কষ্ট কমাতে কোন বাড়তি ভূমিকা রাখেনা। আমাদের দেশে যে সমস্ড় অয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় যেমনঃ ইরিয়ান, এনুষ্ট্যাট, নুপারকেইনাল ও হেডেনসা এবং রিলিচ রেকটাল অয়েন্টমেন্ট । এগুলো মলদ্বারের সামান্য ভিতরে দিনে ২ - ৩ বার লাগাতে হয় ৭ - ১৪ দিন।

সিজ বাথ বা গরমপানির সেক ঃ

সিজ বাথ, হিপ বাথ বা গরম পানির সেক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে একটি গামলায় গরম পানি (৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) দিয়ে তার ভিতর চা চামচের ২ চামচ লবন দিয়ে নিতম্ব ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে ১০ মিঃ, দিনে ২ - ৩ বার। এতে মলদ্বারের ব্যথা কমে। ডাঃ দোদি গবেষনা করে দেখিয়েছেন যে গরম সেকের কারনে মলদ্বারের ভিতরের চাপ কমে যায় যার জন্য ব্যাথাও কমে যায়।

বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসাঃ রিং লাইগেশন পদ্ধতি

আমরা সবাই জানি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এমন একটি উন্নততর প্রযুক্তির ফলে আজ ৮০-৯০% পাইলস রোগী বিনা অপারেশনে এবং বিনা ব্যথায় নিরাময় করা সম্ভব।

১৯৫৪ সালে ডাঃ বে-ইসডেল প্রথম এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন এবং এর সাহায্যে তিনি বিনা অপারেশনে বহির্বিভাগে পাইলসের সফল চিকিৎসা পদ্ধতি প্রদর্শন করে সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্য এর আগে ১৮৬৯ সাল থেকে বিনা অপারেশনে ইনজেকশনের মাধ্যমে পাইলসের চিকিৎসা শুর" হয়েছে। কিন্তু ইনজেকশনের সাফল্য আশাব্যাঞ্জক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটা শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের পাইলসে ভাল ফল দিতে সক্ষম। বারে বারে ইনজেকশন দিয়ে অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে "রিং লাইগেশন" পদ্ধতি পাইলসের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ে্ড়র সূচনা করে। ১৯৬২ সালে ডাঃ জে ব্যারন এই যন্ত্রটির উন্নততর সংস্করণ বের করেন এবং দু'টি গবেষণা প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে এ পদ্ধতিটি অত্যন্ড় চমৎকার ফলাফল দিচ্ছে। এরপর বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারিতে প্রোথিতযশা আমেরিকান সার্জন ডাঃ মারভিন এল করম্যান একটি গবেষণা প্রবন্ধে প্রকাশ করেন এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে পাইলস চিকিৎসার অভাবনীয় সাফল্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে "রিং লাইাগেশন" পদ্ধতিতে পাইলস রোগীদের ৮০% বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করা সম্ভব।

কোন ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

কয়েকটি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব পাইলস রোগীকে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে যাদের চিকিৎসা করা যাবে না তাদের উপসর্গগুলো হচ্ছে - বহিঃস্থিত পাইলস, যদি সাথে এনাল ফিশার বা ফিস্টুলা থাকে অথবা এমন পাইলস যা সবসময় বাইরে ঝুলে থাকে।

চিকিৎসা সংক্রান্ড় খুঁটিনাটি ঃ

এ চিকিৎসায় একটি যন্ত্রের সাহায্যে পাইলসের মাংসপি"টিকে ধীরে ধীরে কাটার ব্যবস্থা করা হয়। এতে সাধারণত রোগীরা ব্যথা পান না। এ চিকিৎসার ফলে পায়ুপথের ভিতরের পাইলসগুলো আর ফুলে ওঠার সুযোগ পায় না। যেহেতু পাইলস তিন বা ততোধিক থাকে তাই একবার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। এ কারণে কিছু দিনের ব্যবধানে ২-৩ বার এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। চিকিৎসকের চেম্বারেই এ চিকিৎসা সম্ভব। সাধারণতঃ অজ্ঞান বা অবশ করার প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও ডুশ দিয়ে পেট পরিষ্কার করে নিতে হয়। চিকিৎসার পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রোগী বাসায় চলে যেতে পারেন। মফস্বলের রোগীরা পরদিন চলে যেতে পারেন।

চিকিৎসার পূর্বে প্রকটস্কপি ও সিগময়ডস্কপি করে মলদ্বারের গভীরে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে। কারণ পায়ুপথে রক্তক্ষরণের অনেক কারণ রয়েছে, যার মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। অতএব, পায়ুপথে রক্ত গেলেই পাইলস হয়েছে বলে সবাই ধরে নেন। এ ধারণা ভুল। প্রথমত পরীক্ষা করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রক্ত যাওয়ার সঠিক রোগ নির্ণয় করবেন। এরপর চিকিৎসার প্রশ্ন।

চিকিৎসা পরবর্তী উপদেশ ঃ

কোষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যেন মলত্যাগে কষ্ট না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাতলা পায়খানা দুই-ই খারাপ। মাঝে মধ্যে রক্ত যেতে পারে। তবে চিকিৎসার সম্পূর্ণ কোর্স শেষ হলে আর রক্ত যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

হার্টের রোগীদের জন্য ঃ

অনেকে আছেন পাইলসকে অবহেলা করেন। যদি এমতাবস্থায় আপনার কোনরূপ হৃদরোগ হয় তাহলে হৃদরোগের চিকিৎসার পূর্বে আপনার বিশেষজ্ঞ আগে পাইলস অপারেশন করে আসার উপদেশ দিবেন। কারণ, হৃদরোগ অপারেশনের পর রক্তজমাট বাধা নিরোধক ঔষধ খেতে হবে বহুদিন। তখন পাইলসের রক্ত যাওয়ার পরিমাণ বিপদজনকভাবে বেড়ে যাবে। কারণ তখন আপনাকে এমন ঔষধ দেয়া হবে যাতে আপনার রক্ত জমাট বাধবে অনেক দেরীতে। এমনকি অনেক উচ্চ রক্ত চাপের রোগী এসপিরিন, ডিসপ্রিন ও ইকোসপিরিন জাতীয় ঔষধ নিয়মিত খাচ্ছেন। এগুলো দেয়া হয় হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য। ঔষধটি রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। এমতাবস্থায় পাইলসের রক্ত বন্ধ করা খুবই কষ্টকর। অতএব অবহেলা না করে সময় থাকতে পাইলসের চিকিৎসা করে নেয়া জর"রি।

জটিলতা ঃ

চিকিৎসার পর রোগীর সামান্য অস্বস্ড়ি লাগতে পারে। কারো কারো অল্প ব্যথা হতে পারে। চিকিৎসা চলাকালীন মাঝে মাঝে রক্ত যেতে পারে।

চিকিৎসার ফলাফল ঃ

বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে দেখা যায় যে রিং লাইগেশন পদ্ধতিতে চিকিৎসার ফলে ৮০-৯০% রোগী বিনা অপারেশনেই আরোগ্য লাভ করেন। এ ব্যাপারে বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঃ

আমি বিগত নয় বছরে বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথের রোগাক্রান্ড় ২৯,৬৩৫ রোগীর উপর গবেষণা করে দেখেছি যে, এদের ১৮% পাইলসে ভুগছেন। বিগত নয় বছরে আমরা ২,৩৪৫ জন পাইলস রোগীকে "রিং লাইগেশন" পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে আশাতীত ফল পেয়েছি। এদের শতকরা ৮৮ জন এ চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ রোগীর বয়স ছিল ৪ বছর এবং সর্বজ্যেষ্ঠ রোগীর বয়স ৯৪ বছর। তবে বেশির ভাগ রোগীই ২০-৫০ বছর বয়সের। যারা এ চিকিৎসায় ভাল হননি তাদের অপারেশন করার পর সবাই সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন। এ চিকিৎসা পদ্ধতিটি সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত। এটি আন্ড়র্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, এ পদ্ধতিটি অপারেশনের বিকল্প একটি যুক্তিসঙ্গত সফল পদ্ধতি।

পাইলস রোগে হাতুড়ে চিকিৎসার পরিণতি

আমাদের সমাজে এখনও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রচলিত আছে। এর মূল কারণ শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক ও সচেতনার অভাব। পাইলস ও জন্ডিস রোগে হাতুড়ে চিকিৎসার দৌরাত্ব বেশি। এই রাজধানীর অসংখ্য লাইটপোস্টে হাতুড়ে ডাক্তারদের তথাকথিত বিনা অপারেশনের পাইলসের চিকিৎসার সাইনবোর্ড দৃশ্যমান। এসব সাইনবোর্ড ও হাতুড়ে চিকিৎসকদের সমারোহ সবচেয়ে বেশি নামকরা বাস স্ট্যান্ডগুলোর আশে পাশে।

আমাদের দেশের অজস্র মানুষ এসব হাতুড়ে চিকিৎসকদের খপ্পরে পড়ে আজীবনের জন্য মলদ্বার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এসব ভুক্তভোগীরা নিকটাত্মীয়দের নিকটও তাদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ করেন না। লোকলজ্জার ভয়ে এবং নিজের বোকামী প্রকাশ হয়ে পড়বে ভেবে কেহ প্রকাশ করেন না। শুধুমাত্র চিকিৎসকদের কাছে এসব তারা ব্যক্ত করেন। অনেকে তার স্ত্রীকেও জানান না। অনেক রোগী বলেন, স্যার আমি আপনার কাছে এসেছি আমার স্ত্রীও জানে না।

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে আজকে শুধু একজন রোগীর কথা বলব। জনাব মোঃ আঃ জব্বার (ছদ্ম নাম), বয়স ৩৮, বাড়ি, ছাগলনাইয়া, ফেনী, ওমানে চাকুরী করেন। পাইলসের সমস্যা তীব্রতর হলে ২০০০ সালের অক্টেবরে দেশে আসেন এবং ঢাকার একটি বাসস্ট্যান্ডে পাইলস চিকিৎসা কেন্দ্র দেখে সেখানে যান। সেখানকার হাতুড়ে ডাক্তার তাকে অপারেশনের কথা বললে রোগী রাজি হন। অপারেশনের পর থেকে রোগীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অনবরত ব্যথা ও জ্বালাপোড়া। বিশেষ করে পায়খানা করার পর প্রচুর রক্ত যায় এবং মারাত্মক ব্যথা ও জ্বালাপোড়া করে। মাস খানেক পর দেখা যায় রোগী আর পায়খানা করতে পারছেন না। ধীরে ধীরে মলদ্বার সংকুচিত হতে থাকে এবং রোগী ভাত, মাছ বাদ দিয়ে শুধু সরবত ও বার্লি খেয়ে জীবন যাপন শুর" করেন এতেও পায়খানা করতে না পারলে রোগী আমার স্মরনাপন্ন হন। পরীক্ষা করে দেখি যে মলদ্বার এমন সর" হয়েছে যে শুধুমাত্র একটি শলাকা বা বল পয়েন্ট কলমের মাথটুকু প্রবেশ করে। রোগীর বক্তব্য তখন এরূপ "স্যার, পায়খানায় বসলে মলদ্বার দিয়ে কিছু বের হয়না, শুধু চোখ দিয়ে পানি পড়ে।" এমতবস্থায় রোগী অন্যান্য অভিজ্ঞ সার্জনদেরও মতামত নেন। তাদের মতে এ ধরনের অপারেশন দেশে সম্ভব নয় বিধায় তারা সিংগাপুর যেতে পরামর্শ দিলেন। রোগী স্বচ্ছল না হওয়ায় অপারেশনের জন্য আমার স্মরনাপন্ন হন। রোগীকে আমরা প্রথমে পেটে কলোষ্টমি ব্যাগ লাগিয়ে দেই যাতে মলদ্বার দিয়ে পায়খানা না যায়। এরপর দুই ধাপে মলদ্বারে প-াস্টিক সার্জারী করে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মলদ্বার নতুন করে পূর্ণগঠন করি। এ অপারেশনে মলদ্বারের দু'পাশ অর্থাৎ হিপ থেকে মাংশ নিয়ে মলদ্বার নতুন করে বানানো হয়। এরপর চতুর্থ অপারেশন করে তার পেটের কলোস্টমি ব্যাগ বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি স্বাভাবিকভাবে আবার মলত্যাগ করতে পেরে যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। এত কিছুর পরও রোগীর ধারণা ছিল এই অপারেশনের ফলে হয়তো তার সাময়িক উন্নতি হয়েছে। ২-১ মাস পর হয়তো তার মলদ্বার আবারও সংকুচিত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে অপারেশনের এক বৎসর অতিবাহিত হলে রোগীটি আবার আসেন এবং জানান যে তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ্য। মলত্যাগে তার কোনরূপ অসুবধিা নেই।

উলে-খ্য এ ধরনের অপারেশন বাংলাদেশে এই প্রথম। লেখক এ বিষয়ে এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে তার অপারেশনের সাফল্য উপস্থাপন করেন। লেকচারের শিরোনাম ছিল,"হাতুড়ে চিকিৎসার কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া মলদ্বার পুনর্গঠনে জটিল অপারেশনের সাফল্য - বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রথম অপারেশন"।

সম্মানিত রোগীদের প্রতি অনুরোধ আপনারা হাতুড়ে চিকিৎসা করে মলদ্বারের অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবেন না। মলদ্বারের প্রতিটি রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুষ্ঠ সমাধান রয়েছে। পাইলস রোগীদের ৯০% ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়া আমরা যন্ত্রের সাহায্যে সফলভাবে চিকিৎসা করছি। মলদ্বারের বিভিন্ন রোগের এবং পায়ুপথ ক্যান্সারের অত্যাধুনিক অপারেশন এখন দেশেই হচেছ। অতএব সম্মানিত রোগীদের এ জাতীয় চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা এ জাতীয় সমস্যায় ভুগছেন এমন বিদেশী রোগীদেরও আমাদের দেশে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পাইলস কি অপারেশন করলে আবারো হয়?

পাইলসের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাওয়া, মলদ্বারে মাংসপিন্ড ফুলে ওঠা, যা কখনো কখনো মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়ে এবং হাত দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এ রক্ত সাধারণত টাটকা লাল হয়। মনে রাখতে হবে পায়ুপথে ক্যান্সার হলেও রক্ত যায়। অতএব নিজে সিদ্ধান্ড় নেবেন না যে, আপনার পাইলস হয়েছে। এক্ষেত্রে মলদ্বারের ভেতর বিশেষ ধরনের পরীক্ষা যেমন, সিগময়ডস্কপি বা কোলনস্কপি ছাড়া কারো পক্ষে সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

আধুনিক প্রযুক্তির ফলে অপারেশন ছাড়াই বেশিরভাগ পাইলস রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। এ পদ্ধতির নাম হচ্ছে রিং লাইগেশন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ফলে এখন ৮০-৯০% পাইলস রোগী অপারেশন ছাড়াই ভালো হচ্ছেন। লেখক বিগত নয় বছরে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে চমৎকার ফল পেয়েছেন। প্রথিতযশা আমেরিকান কলোরেক্টাল সার্জন ডাঃ মারভিল এল করম্যান এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে বলেন যে, আমি এখন ৮০-৯০% পাইলস রোগীকে অপারেশন এড়াতে পারছি।

প্রায়ই আমরা একটি বিব্রতকর সমস্যার সম্মুখীন হই। সেটি হচ্ছে সম্মানিত রোগীরা জিজ্ঞাসা করেন যে, শুনেছি পাইলস অপারেশন করলে আবার হয় তাই আর অপারেশন করে লাভ কী? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। রোগীদের এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার। রেকটাম ও মলদ্বারের অনেক রোগ আগের যুগে অপারেশন করে ভাল করা দুস্কর ছিল। পাইলস বা ফিষ্টুলা অপারেশন করলে আবার হওয়াই ছিল নিয়ম। এ প্রসঙ্গে আমি আমেরিকান সার্জন অধ্যাপক ডাঃ মারভিল এল করম্যানের লেখা "কোলন এন্ড রেকটাল সার্জারী" নামক টেক্সট বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে এবং এ জাতীয় সার্জারীর অতীত প্রেক্ষাপটে বুঝতে সুবিধা হবে। অধ্যাপক ডাঃ করমান তার বইয়ে লেখেন যে বিগত দুই হাজার বৎসর ধরে মলদ্বারে ফিষ্টুলার উপর অসংখ্য বই ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রমাণ করে যে এটি একটি বিশেষ সমস্যা এবং ফিষ্টুলার অপারেশনের ব্যর্থতার জন্য সার্জনদের যত বদনাম হয়েছে অন্য কোন অপারেশনে আজ পর্যন্ড় তা হয়নি। এ কারণে ১৮৩৫ সনে ডাঃ স্যালমন লন্ডনের কেন্দ্রে একটি আলাদা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেওয়া হয় সেন্ট মার্কস হসপিটাল ফর দ্য ডিজিজেস অব কোলন এন্ড রেকটাম। যে হাসপাতলের উদ্দেশ্য ছিল বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা এবং এজাতীয় বিশেষজ্ঞ সার্জন তৈরী করা। যারা এজাতীয় রোগগুলো বিশেষজ্ঞ হিসবে নৈপুন্যের সাথে চিকিৎসা করবেন যাতে আবার হওয়ার বদনাম থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি সম্মানিত রোগীদের প্রশ্নের যথার্থতা এবং এর ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা। বিগত ১৬৫ বৎসর ধরে উন্নত দেশগুলোতে এ কারনেই বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী একটি আলাদা বিশেষজ্ঞ বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত। এবার আসা যাক মূল প্রশ্নের তাত্ত্বিক আলোচনায়। প্রশ্ন হচ্ছে পাইলস অপারেশনের পর আবার হয় কি না। মলদ্বারে সাধারণত হয় এমন তিনটি রোগ হচ্ছে পাইলস, এনাল ফিশার ও ফিষ্টুলা। কিন্তু সাধারণ রোগীরা সব কটি রোগকেই পাইলস বলে মনে করেন। তাই এসব রোগের চিকিৎসার পর যখন কোন সমস্যা হয় তখন তারা পাইলস আবার হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাকে পাইলস বা হেমোরায়েড বলে সেটি অপারেশনের পর আবার হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ২ ভাগ। বেশীর ভাগ রোগী যারা পাইলস আবারও হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা এটি বলতে সাধারণত বোঝান মলদ্বারে বাড়তি ত্বক বা মাংশপিন্ড অথবা চুলকানি হয়েছে এটিকেও কেউ কেউ আবার পাইলস হয়েছে

বলে ধরে নেন। এসমস্যাগুলো দ্বারা পাইলস আবার হয়েছে বোঝায় না। মলদ্বারের চুলকানি বিভিন্ন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র।

খুবই কম অর্থাৎ ২% ক্ষেত্রে হলেও পাইলস আবার হতে পারে। ব্যাপারটি কি করে ঘটে তা বোঝাতে বিস্ড়ারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এ ব্যাপারটি ঘটার পেছনে অপারেশনের একটি কৌশলগত কারণ রয়েছে। অপারেশনের সময় যে শিরাগুলো স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল পরবর্তী সময়ে মলদ্বারের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অথবা কোলেটারাল রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কয়েক বছর পর এগুলো পাইলস আকারে দেখা দিতে পারে। তাছাড়া পাইলস যখন খুব বড় হয় তখন মনে হয় মলদ্বারের চতুর্দিকের সমস্ড় এলাকাই পাইলসে ভর্তি। তখন একজন সার্জনের মনে হয় সমস্ড় স্ফীত অংশই কেটে ফেলে দিতে হবে নইলে পাইলস থেকে যাবে। যদি এভাবে সবকিছু কেটে ফেলে দেয়া হয় তাহলে মলদ্বার সংকুচিত হয়ে মলত্যাগে বাধা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সঠিক কৌশলটি হচ্ছে দুটি পাইলসের মাঝখানে আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে কিছু ঝিলি- ও ত্বক সংরক্ষণ করতে হবে। যেহেতু এর তলদেশে পাইলসের শিরাগুলো বিস্ড়ৃত থাকে তাই ঝিলি-র তলদেশ থেকে সতর্কতার সঙ্গে এ শিরাগুলোকে কেটে নিয়ে আসতে হবে। এ কৌশল অবলম্বন করলে পাইলসের শিরাগুলো যেমন সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা সম্ভব, তেমনি দুটি পাইলসের মধ্যবর্তী ঝিলি- এবং ত্বকও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে, যাতে মলদ্বার সংকুচিত (Anal Stenosis) হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

যাহোক অপারেশনের পর অল্প কিছু ক্ষেত্রে যখন আবারও পাইলস দেখা দেয়, তখন এগুলোর উপসর্গ ততটা তীব্র হয় না। এটিকে তখন বিনা অপারেশনে রিং লাইগেশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা সম্ভব। সাধারণত আবার অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

ব্যক্তিগত মতামত ঃ

লেখক বিগত সতের বছরের ১,১৫,৬৩৫ জন পায়ুপথের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, পাইলস ও ফিস্টুলা রোগ অপারেশন করলে আবার হয়, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তবে বিনা অপারেশনে রিং লাইগেশন পদ্ধতিতে পাইলস চিকিৎসা করলে ৯০ শতাংশ রোগী ভালো হন, বাকিদের অপারেশন প্রয়োজন হয়।

পাইলস কি একটি গোপন রোগ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আধুনিক ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ। তারপরও তার যত আক্ষেপ ও অনুশোচনা। মনে হয় কোন পাপ করেছি। নইলে আজ এভাবে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম কেন? কি সেই অনুশোচনা? কি সেই পাপ? আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও পাইলস হওয়াকে একটি গোপন রোগ হিসেবে মনে করেন। কেউ কেউ বলেন এটি কি কাউকে বলা যায়? আমার স্ত্রীও জানেনা যে আমার পাইলস হয়েছে। মূল সমস্যা হল চিকিৎসকের কাছে এসে পাইলসের গোপন স্থানটি দেখাতে হবে এখানেই যত সমস্যা। অনেকেই এটিকে অশ-ীলতা হিসেবে ভাবেন। কারও হার্টে কোন অসুবিধা হলে বা টনসিলে ব্যাথা হলে যে কারও সাথে খোলা মেলা আলাপ করেন অথচ পাইলসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উল্টো। আধুনিক এক যুবকের কথা বলছি। চেম্বারে ঢুকে প্রথমে তার সঙ্গী সকলকে বাইরে যেতে বললেন তারপর স্ত্রীকেও। এরপর র"মে আমি এবং সেই যুবক রোগী। আমাকে অনুরোধ করলেন চেম্বারের পর্দাঘেরা অংশে যেতে। আমিও কিছু বারণ করছি না। ভাবছি হয়ত তার গোপন কোন রোগ বা যৌনরোগ আছে। আশ্চর্য হলাম তখন যখন রোগীটি খুবই বিব্রতভাবে আমাকে বললেন যে স্যার আমার মলদ্বার দিয়ে রক্ত যায়। আমি খুবই বিব্রতকর অবস্থায় আছি। আমার স্ত্রীকে ও জানাতে চাইনা। দয়া করে আমাকে একটু চিকিৎসা দিন।

অন্য একজন রোগী বয়স ৬০। হাউজিং এর অফিসার ছিলেন। বহু বছর পূর্বে ঢাকা শহরে এক হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে মলদ্বারে ইনজেকশন নিয়েছেন। পরে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন যে মলদ্বারে নাইট্রিক এসিড ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। ঐ ইনজেকশন দেয়ার পর মলদ্বারের আশে পাশে মাংস পঁচে গিয়ে মলদ্বার এমনই সর" হয়েছে যে তিনি আর মলত্যাগ করতে পারেন না। সামান্য ছিদ্র দিয়ে সবসময় পায়খানা চুইয়ে পড়ে। ভিতরে সর্বদা তুলার প্যাড পরে থাকেন। তাকে বললাম যে দেশে আইন রয়েছে, শরীরে এসিড দিলে তার সাজা হয় আপনি বিচার চান। রোগীর উত্তর ছিল এরূপ, "স্যার বয়স হয়েছে মেয়ে জামাই আছে, নাতি আছে, সমাজে এটি জানাজানি হয়ে গেলে মুখ দেখাতে পারব না। তাই এ ঘটনা প্রকাশ করতে চাইনা। আপনি দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা।"

এ কারণে আমাদের দেশে পাইলসের হাতুড়ে চিকিৎসার এত প্রসার। প্রতিদিন মলদ্বারে হাতুড়ে অপচিকিৎসার জটিলতা নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে অপচিকিৎসায় তার মলদ্বার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তখন লোকলজ্জার ভয়ে এবং নিজের বোকামীর কথা ভেবে কেউই হাতুড়ে ডাক্তারের বিচার চাইতে যান না। সবারই একই কথা হাতুড়ে চিকিৎসার কুফল আমাদের জানা ছিল না এবং সামজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবার কারণে কেউই নিজের দুরবস্থার কথা পর্যন্ড় প্রচার করতে চান না।
অনেকেই বলেন যে, স্যার আমার পাইলস অপারেশন হয়েছে শুনে সহকর্মীদের অনেকেই বলল যে, তার ও বহুদিন যাবত এ সমস্যা আছে কিন্তু কাউকে দেখান নি। এ সমস্ড় সহকর্মীরা আগে কখনও এ ব্যাপারে মুখ খোলেন নি।

অনেক রোগী বিশেষত মহিলা রোগীরা বছরের পর বছর ভোগেন কিন্তু কাউকে দেখান না। শেষ পর্যন্ড় যখন বয়স বেড়ে যায় ৬০-৭০ হয় তখন আর সহ্য করতে পারেন না। শরীরে অন্যান্য রোগ যেমন ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ইত্যাদি হয়েছে তখন ছেলে বা নাতিপুতিদের নিয়ে আসেন এবং বলেন যে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত উনি কাউকে দেখাবেন না বলে জেদ ধরেছিলেন এখন আর সহ্য করতে পারছেন না। এই ভোগান্ড়ির মূল কারণ কুসংস্কার।
দেশের একজন নামকরা উপাচার্যের স্ত্রীর পাইলস হয়েছে বহু বছর যাবত। কিন্তু তিনি ডাক্তারকে দেখাবেন না। শেষে এমন অবস্থা যে পায়খানা না করলেও রক্ত যায়। তার কয়েক ছেলেমেয়ে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। শেষ

পর্যন্ড় তাকে দেখলাম এবং বললাম যে বিনা অপারেশনে তিনি ভাল হবেন। কিন্তু রোগী বিশ্বাস করলেন না। অতপর দু'বার তার রিংলাইগেশন পদ্ধতিতে বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসা করায় তিনি সম্পূর্ণ ভাল হন। এরপর তিনি মন্ড়ব্য করলেন যে, ভেবেছিলাম পাইলস নিয়েই কবরে যাব এখন দেখলাম এত সহজে ভাল হওয়া যায়। কেন যে অযথা এত ভুগলাম।

সম্মানিত রোগীদের জ্ঞাতার্থে বলছি, মলদ্বারের প্রতিটি রোগ বিজ্ঞানসম্মত এবং এর প্রতিটি রোগই চিকিৎসার সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়। বিশেষ করে পাইলস ৯০% বিনা অপারেশনে ভাল করা যায়। বিগত নয় বছরে ২,৩৪৫ জন রোগীকে রিংলাইগেশন পদ্ধতিতে বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করে আমি দঢ়ভাবে আস্থাবান যে শতকরা ৯০% পাইলস রোগী বিনা অপারেশনে ভাল হন।

পাইলসের আধুনিক চিকিৎসা

পাইলস বা অর্শ্ব রোগ যে কোন বয়সে হতে পারে। পুরুষ অথবা মহিলা সবার এরোগ হতে পারে। সর্ব কনিষ্ঠ ৫ মাস বয়সের শিশুর পাইলস হতে দেখেছি। সাধারণতঃ মলদ্বারে যে রোগই হোকনা কেন তাকে রোগীরা পাইলস বলে ধরে নেন। আসলে মলদ্বারে বিভিন্ন রোগ হয় যাদের উপসর্গের মধ্যে বেশ খানিকটা মিল থাকার কারনে রোগীদের এই বিভ্রান্তি। যেমন পায়ুপথে রক্ত যায় এমন রোগের মধ্যে রয়েছে পাইলস, ফিষ্টুলা, এনাল ফিশার পলিপ, ক্যান্সার, আলসারেটিভ কোলাইটিস, আমাশয় ইত্যাদি। বিগত নয় বৎসরে আমি ২৯,৬৩৫ জন রোগীর উপর গবেষণা করে দেখেছি যে, এদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন পাইলস, ২% থ্রম্বোডস পাইলস, শতকরা ৩৫ জন এনাল ফিশার, শতকরা ২.২ পাইলস ফিষ্টুলা এনালফিশার একত্রে আছে, শতকরা ১৫ ভাগ ফিষ্টুলা রোগী, শতকরা ২.৩৩ পায়ুপথ ক্যান্সার, শতকরা ৩.৫ রেকটাল পলিপ, শতকরা ২ মলদ্বারে ফোড়া, অজানা কারনে মলদ্বারে ব্যাথ্যা শতকরা ১.৮৪ ভাগ, শতকরা ৬ ভাগ ক্রনিক আমাশয় (ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম), ০.২৫% অজানা কারনে মলদ্বারে চুলকানি, ০.৫% অজানা কারনে রক্ত যাওয়া রোগে ভুগছেন। এ গবেষনার ফলাফলে আমরা দেখতে পাই যে মলদ্বারে শুধু পাইলস রোগই হয় না আরো অনেক রোগ হয় যার মধ্যে মাত্র শতকরা বিশভাগ রোগী পাইলসে আক্রান্ত।

উপসর্গ ঃ

এ রোগে রোগীরা যে সমস্ত উপসর্গের কথা বলে থাকেন তা হলো, পায়ুপথে রক্ত যাওয়া, চুলকানো, গ্যাজ মাংশপিন্ড, মলদ্বার ফুলে উঠা, কিছু ঝুলে পড়ছে এমন এবং ব্যাথা হওয়া। ৫০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫০ ভাগ লোক কোন না কোন সময় পাইলসের সমস্যায় ভুগছেন। এতে অনবরত রক্ত যায় না। প্রথম দিকে বৎসরে একবার, দুবার এরপর মাসে একবার এভাবে আস্তে আস্তে ঘন ঘন রক্ত যায়। রক্ত সাধারণত পায়খানার পর ফোটায় ফোটায় অথবা নালে যায়। সামান্য রক্ত যাওয়া থেকে অতিরিক্ত রক্ত যেয়ে গভীর রক্তশূন্যতা হতে পারে। অনেক দিন অতিবাহিত হলে মলদ্বারের পাশে মাংশপিন্ড ফুলে ওঠে। কখনও কখনও বাইরে ঝুলে পড়ে। রোগী নিজে হাত দিয়ে চাপদিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। আরো বেশী দিন গড়ালে মংশপিন্ডটি সবসময় বাইরে ঝুলে থাকে এবং ভিতরে ঢুকানো যায়না। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না, তবে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিলে তখন ব্যথা হয়।

কারণ ঃ

এ রোগের জন্য কোন নির্দিষ্ট একটি কারণ দায়ী নয় বরং অনেক কারনেই এরোগ হতে পারে যেমন, বংশগত, দৈহিক গঠন জনিত, পুষ্টি, পেশা, আবহাওয়া, মানসিক সমস্যা, বার্ধক্য, হরমোনজনিত, খাদ্য ও ঔষধ, গর্ভাবস্থা, ব্যায়াম, অতিরিক্ত কাশি, আটশাট পোষাক, কোষ্ঠ কাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি।

আফ্রিকার গ্রামের বাসিন্দারা সারাবৎসর আঁশ জাতীয় খাবার খায় বলে তাদের সাধারণত পাইলস হয় না। কারন আঁশ জাতীয় খাবার খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না আর তাই মলত্যাগের সময় বেশী কোত দিতে হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে সামান্য কিছু ভূষির অভাবে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম হয়েছে। কারন ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন ভীষনভাবে পাইলসের সমস্যায় ভুগছিলেন। অথচ তিনি যদি নিয়মিত খাবারে কিছু করে আঁশ জাতীয় খাবার খেতেন তাহলে তিনি হয়ত পাইলসে ভুগতেন না। ফলে যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা ও অনেকটা কমে যেত যার ফলে নেপোলিয়নের ইউরোপ জয় সম্ভব হতে পারত, তাঁকে পরাজয় বরণ করে নির্বাসনে যেতে হতো না। ডাঃ গিববনস এক বৈজ্ঞানিক গবেষনায় দেখিয়েছেন যে পাইলসের রোগীর সবাই

কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন এমন নয় আবার যারা দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য ভুগছেন তারা সবাই পাইলসে ভুগছেন না।

পাইলসের শ্রেণীবিভাগ ঃ

একে দুই ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। (১) অবস্থাণগত (২) ডিগ্রী বা ভয়াবহতা অনুযায়ী

অবস্থানগত ঃ যেমন - (ক) বহিঃস্থিত পাইলস (খ) অভ্যান্ড়রীণ পাইলস (গ) দুটির সংমিশ্রন।

ডিগ্রী অনুযায়ী ঃ যেমন - (ক) প্রথম ডিগ্রী (খ) দ্বিতীয় ডিগ্রী (গ) তৃতীয় ডিগ্রী (ঘ) চতুর্থ ডিগ্রী

প্রথম ডিগ্রী পাইলস ঃ পাইলসের মাংশপিন্ডটি মলদ্বারের ভিতরে থাকে কিন্তু বাহিরে আসে না।

দ্বিতীয় ডিগ্রী পাইলস ঃ মলত্যাগের সময় পাইলসটি বাইরে ঝুলে পড়ে এবং আপনাআপনি ভিতরে ঢুকে যায়।

তৃতীয় ডিগ্রী পাইলস ঃ পাইলসের মাংশপিন্ডটি বাহিরে ঝুলে পড়ে এবং হাত দিয়ে চাপদিয়ে ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয় অন্যথায় ভিতরে যায় না।

চতুর্থ ডিগ্রী পাইলস ঃ পাইলসটি অনবরত বাইরে ঝুলে থাকে এবং ভিতরে ঢুকানো যায় না।

পাইলসে কখন ব্যাথা হয় ঃ

পাইলস যখন রক্ত জমাট বেধে ফুলে তখন প্রচুর ব্যাথা হয়। এটি সাধারণত বহিঃস্থিত পাইলসে হয়। বহিঃস্থিত পাইলসে রক্ত যায় না। এ পাইলসের দুটি ধরন আছে। (ক) একটিতে মলদ্বারের বাইরে বেশ ফুলে থাকে। (খ) অন্যটিতে কোন ফোলা থাকে না কিন্তু হঠাৎ করে ফুলে ওঠে এবং ব্যাথা হয়। ইন্টারনাল পাইলসেও ফুলে ব্যাথা হতে পারে এটি হয় সাধারণত যারা মলত্যাগের সময় খুব কোত দেয়, ভারী ওজন তোলে, যারা দীর্ঘস্থায়ী আমাশয়ের কারনে বারে বারে টয়লেটে যায় অথবা যারা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কাজ করে যেমন পাইলট, ট্রাক ড্রাইভার ইত্যাদি।

পাইলসের মত একই উপসর্গ অন্যান্য কি কি রোগে হতে পারে?

পাইলসের মত একই উপসর্গ হতে পারে এমন রোগের মধ্যে রয়েছে পলিপ, প্রোলাপস বা মলদ্বার ঝুলে পড়া, ক্যান্সার ও এনাল ফিশার। এক্ষেত্রে মলদ্বারের ভিতর বিশেষ ধরনের এন্ডোস্কপি যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হয় যাকে আমরা বলি প্রকটোস্কপি, সিগময়ডস্কপি ও কোলনস্কপি। এ জাতীয় পরীক্ষায় যদি কোন সন্দেহ জনক জিনিষ পাওয়া যায় তাহলে বায়োপসি বা মাংশ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয় যে এটি ক্যান্সার বা অন্যকিছু। পায়ুপথের বিভিন্ন সমস্যায় এজাতীয় পরীক্ষা করা একান্ড়জরুরী অন্যথায় রোগনির্ণয়ে ভুলভ্রান্ড়িহতে বাধ্য। মফস্বলের অনেক রোগী আছেন যাদের এরূপ পরীক্ষা করা হয়নি তারা দীর্ঘ দিন ভোগার পর যখন এজাতীয় পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে ভিতরে ক্যান্সার বা অন্য কোন রোগ আছে। দীর্ঘদিন দেরী করার কারণে ক্যান্সার জাতীয় রোগের চিকিৎসা দুরূহ হয়ে পড়ে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ

পায়ুপথের ভিতর পর্যবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা দরকার যেমনঃ প্রকটস্কপি, সিগময়ডস্কপি, কোলনস্কপি, বেরিয়াম এনেমা এক্সরে ইত্যাদি।

চিকিৎসা ঃ

পাইলসের রক্ত যাওয়ার কারণ হতে পারে অতিরিক্ত কোত দিয়ে পায়খানা করা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়া। এ জন্য খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে, মল নরম করার জন্য ঔষধ খেতে হবে, এবং ডায়রিয়ার বা আমাশয়ের চিকিৎসা করতে হবে।

যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম বা ক্রনিক আমাশয় আছে তাদের জন্য দুধ জাতীয় খাবার এবং তৈলাক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। মলদ্বারের হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে। তাই বলে ঘন ঘন সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে হবে তা নয়।

বিভিন্ন ধরনের অয়েন্টমেন্ট ক্রীম বা লোশন পাওয়া যায় যেগুলো ব্যবহার করলে সাময়িক উপকার পাওয়া যায়।

সাপোজিটরি ঃ **(Suppository)**

এগুলো ছোট বুলেটাকৃতি ঔষধ যা পায়ূপথের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। মিসরের প্রাচীন সভ্যতার সময় থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে।

সাধারণত ঃ তিন ধরনের কাজের জন্য সাপোজিটরি ব্যবহার হয়ে থাকেঃ

১। মলত্যাগ ত্বরান্বিত করার জন্য
২। শরীরে ঔষধ প্রয়োগের পথ হিসেবে
৩। পায়ূপথের রোগের চিকিৎসার জন্য

পাইলস যখন মলদ্বারের বাইরে ঝুলে থাকে ঃ

পাইলস যখন বাইরে ঝুলে পড়ে তখন হয় এটি আপনা আপনি ভিতরে ঢুকে যায় অথবা হাতদিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায়ও এটিকে বিনা অপারেশনে ভাল করা যায় বিশেষ করে রিং লাইগেশন পদ্ধতিতে। কিন্তু এ পাইলস যদি অনরবরত বাইরে ঝুলে থাকে তাহলে এতে থ্রম্বসিস বা গ্যাংগ্রীণ হতে পারে। এ অবস্থায় দ্রুত অপারেশন করে ফেলাই উত্তম। অপারেশনের জন্য মোট ৩-৪ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়।

পাইলসে যখন ব্যথা হয় ঃ

আর্শ্ব বা পাইলসে সাধারণত ব্যথা থাকেনা কিন্তু যখন আলসার, গ্যাংগ্রীণ বা থ্রম্বসিস হয় তখন ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সর্বোত্তম চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন।
সিজ বাথ (Sitz bath) বা গরম পানির সেক দিলে মলদ্বারের ব্যথা কমে। পানির উষ্ণতা চলি-শ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হওয়া উচিত, পানিতে অল্প কিছু লবন দিয়ে ১০ মিনিট গামলায় কোমর ডুবিয়ে বসে থাকতে হয়। ডাঃ দোদি এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে গরম পনিতে সেক দিলে মলদ্বারে ভিতরের চাপ কমে যায় যা ঠান্ডা পানি দিলে হয় না।

রিং লাইগেশন ও অপারেশনের মধ্যে কোনটি বেশী কার্যকর ঃ

এদুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশী কার্যকর এ ব্যাপারে ডাঃ মিউরী, ডাঃ চেং, ডাঃ জোনস ও ডাঃ শেফিল্ড আলাদা ভাবে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যাতে দেখান যে এদুটি পদ্ধতির সাফল্যে তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়নি কিন্তু যে ক্ষেত্রে পাইলসটি বাইরে ঝুলে থাকত সে ক্ষেত্রে অপারেশন ভাল কাজ দেয়। তবে যখন পাইলস অনবরত বাইরে ঝুলে থাকে বা অন্যান্য রোগের সাথে থাকে তখন সরাসরি অপারেশন করতে হয়।

আমরা বিগত সতের বৎসর ৮,৩৪৫ জন রোগীকে রিংলাইগেশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছি। শতকরা ৯০% জন রোগী এ পদ্ধতিতে ভাল ফল পেয়েছেন। ১৮% রোগীর সামান্য ব্যথা হয়েছে। চারজন তীব্র রক্তক্ষরনের জন্য অপারেশন করতে হয়েছে।

গর্ভাবস্থায় পাইলস হলে ঃ

গর্ভাবস্থায় মহিলারা প্রায়ই পাইলসের সমস্যায় ভোগেন, এ অবস্থায় বেশী ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্নধরনের ঔষধ ও উপদেশ পালনে রোগীরা উপকার পান। সুষ্ঠু মলত্যাগের ব্যবস্থাপনা করাই এসব চিকিৎসার লক্ষ্য। খুব কম ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হয়। পাইলসে থ্রম্বসিস হলে লোকাল ইনজেকশন দিয়ে এটি অপারেশন করা যায় কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন পইলসে রক্ত যায় এবং বাইরে ঝুলে থাকে এবং এ অবস্থায় অপারেশনই একমাত্র চিকিৎসা বলে মনে হয়। এ প্রশ্নের কোন সহজ সরল সমাধান নেই। ডাঃ স্যালিবি ও তার সহকর্মীরা তাদের হাসপাতলে ১৮,৪৫৫ জন গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ২৫ জনকে পাইলসের অপারেশন করেছেন। তিনজন বাদে বাকী মহিলারা তাদের গর্ভের শেষ তিন মাসে ছিলেন। অপারেশন পরবর্তীতে শুধুমাত্র একজন মহিলার রক্তপাত হয়েছে। বাকীদের ও তাদের সন্ড়ানদের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। তবে অপারেশনগুলো হয়েছিল লোকাল এনেস্থেশিয়া প্রয়োগে।

শিশুর পাইলস সমস্যা

পাইলস শিশুদেরও হয়। তবে প্রকৃত পাইলস শিশুদের কম হয়। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব পাইলস রোগটি আসলে কি? কারণ এটি নিয়ে বিস্ড়র বিভ্রান্ড়ি রয়েছে। ঢাকা শহরের আবাসিক এবং অফিস এলাকার খুব কম সংখ্যক লাইটপোষ্ট আছে, যেখানে হাতুড়ে ডাক্তারদের পাইলসের সাইনবোর্ড নেই। মলদ্বারের যে কোন সমস্যাকে সবাই পাইলস হয়েছে বলে ধরে নেন। পাইলস বলতে বোঝায় মলদ্বারে ফুলে ওঠা মাংসপি বা গ্যাজ। অসংখ্য শিরা মিউকাস ঝিলি-র তলায় ফুলে উঠার কারণে মাংসপি ফুলে উঠে এবং কখনও কখনও রক্ত যায়। পাইলসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম হলো হেমোরয়েড। হেমোরয়েড অর্থ হলো টয়লেটে রক্ত যাওয়া। অভ্যন্ড়রীণ পাইলসে মাংসপি না থাকলেও প্রচুর রক্ত যেতে পারে। আবার অনেক বড় গ্যাজ আছে কিন্তু রক্ত নাও যেতে পারে। এ রক্ত যাওয়ার আবার তারতম্য আছে। তবে সাধারণত কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস পর পর রক্ত যায়। শিশুদের পাইলস হলে বড়দের চেয়ে বেশি রক্ত যায়। বিগত নয় বৎসরে মলদ্বারের সমস্যায় আক্রান্ড় ২৯ হাজার ৬ শত ৩৫জন রোগীর ভিতর ৬ জন শিশুর পাইলস দেখেছি। একজন পাঁচ মাস বয়স থেকে অন্য জন তিন বৎসর বয়স থেকে রক্ত যেতে যেতে মুর্ছা যেত। এরপর রক্ত দিলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠত। এ দু'জনকে বিনা অপারেশনে রিংলাইগেশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণ ভাল হয়েছে। তবে অভিভাবকরা শিশুদের যে পাইলসের সমস্যা অর্থাৎ টয়লেটে রক্ত গেলে চিকিৎসকের কাছে আসেন তাদের বেশির ভাগই পাইলস নয়। শিশুদের টয়লেটে রক্ত যাওয়ার প্রধান কারণ রেকটাল পলিপ। এটি এক ধরনের আঙ্গুর ফলের মতো টিউমার, যা ক্যান্সার নয়। এ টিউমার থেকে প্রচুর রক্ত যায়। এগুলো এক বা একাধিক হতে পারে এবং এরূপ শত শত পলিপ থাকতে পারে-যা থেকে সাধারণত রক্ত ও মিউকাস বা আম যায়। রোগীর অভিভাবকরা মনে করেন যে এটি রক্ত আমাশয় এবং ওষুধ দিয়ে ভাল করা যাবে। রেকটাল পলিপ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে এটিকে কেটে ফেলে দেয়া। রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এটি করতে হয়। অভিভাবকদের ভয়, ছোট্ট শিশুকে অজ্ঞান করলে তার ক্ষতি হবে। কিন্তু বহুদিন রক্ত যাওয়ায় শিশুটি যে রক্তশূন্যতায় ভুগছে সেদিকে তাদের লক্ষ্য থাকে না। সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, দাদি নানিরা অপারেশনের কথা শুনলেই একেবারে বেঁকে বসেন। তাঁদের ধারণা, এতটুকুন শিশুকে কখনও অজ্ঞান করা উচিত নয়। তারপর অনুপায় আধুনিক তর ণ বাবা-মা বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ধরনা দেন ওষুধের চিকিৎসায় এ রোগ ভাল করার জন্য। কিন্তু সেটি কোন ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব নয়।

রেকটাল পলিপ অপারেশনের জন্য একটি শিশুকে কয়েক ঘন্টা হাসপাতালে রাখলেই চলে। রোগীর পেট খালি করার জন্য আগের দিন কিছু ঔষধ দেয়া হয় যাতে পায়খানা ক্লিয়ার হয়। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠার পর খালি পেটে অপারেশন করাই ভাল। এজন্য রোগীকে ঘুম পাড়াবার ইনজেকশন দিতে হয়। একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে টিউমারটি (পলিপ) কেটে আনা হয়। যেহেতু এ অপারেশনে মলদ্বারে কোন কাটাছিড়া করা হয় না তাই অপারেশনের পর ব্যথা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অপারেশনের দু-তিন ঘন্টা পর রোগী স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করতে পারে এবং সরাসরি বাসায় চলে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বহির্বিভাগীয় রোগী হিসাবে পরক্ষণেই চলে যেতে পারে।

শিশুদের অন্য একটি সমস্যা হয়। এতে পায়খানা শক্ত হলে মলদ্বার ফেটে যায় এবং ব্যথা হয়। কিছুটা রক্তও যেতে পারে। কিছুদিন পর মলদ্বারে একটি গ্যাজ দেখা যায়। শিশু টয়লেটে যেতে ভয় পায় ব্যথার কারণে। এ রোগটির নাম এনাল ফিশার। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসক মল নরম করার জন্য ওষুধ দেন, পানি, সবজি, সালাদ খেলে

উপকার পাওয়া যায়, পায়ুপথে মলম লাগানো যেতে পারে। চুলকানি হলে কৃমির ওষুধও দিতে হবে। জন্মের পরপরই যে কোন সময় এ রোগ হতে পারে। সর্বকনিষ্ঠ একমাস দশ দিনের শিশুকে দেখেছি এ রোগে আক্রান্ড় হতে। উপরোক্ত পদ্ধতি ও ওষুধ প্রয়োগেও ভাল না হলে অপারেশন করতে হয়।

মলদ্বারে শিশুদেরও হয় সেরকম আরেকটি রোগ হচ্ছে ফিষ্টুলা বা ভগন্দর। এতে মলদ্বারের পার্শ্বে একটি মুখ থেকে পুঁজ ও রক্ত যায় এবং ব্যাথা হয়। সতেরো মাসের একটি বাচ্চার এ রোগ দেখেছি। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন, তবে এটি শিশুদের খুব কম হয়।

মলদ্বারের প্রতিটি রোগের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এর প্রতিটিতেই সঠিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করা যায়। বড়দের যে রোগটি সবচেয়ে বেশি হয় সেটি হলো পাইলস। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন ৮০-৯০% পাইলস রোগী বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। এ পদ্ধতির নাম হচ্ছে 'রিং লাইগেশন' পদ্ধতি। কোনরূপ অবশ, অজ্ঞান না করেই চেম্বারেই এর চিকিৎসা করা হয়। যে ক্ষেত্রে অপারেশন দরকার সে ক্ষেত্রেও ২-৩ দিন মাত্র হাসপাতালে থাকতে হয়। অপারেশনের পর পাইলস আবার হয়- এ ধারণা সম্পূর্ণ অমুলক। তবে ০২% ক্ষেত্রে আবার হতে পারে। পেটে কৃমি থাকলে তার অবশ্যই চিকিৎসা করা উচিত। তবে কৃমির বাসা থেকে এ রোগের উৎপত্তি- এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ড়।

গর্ভবতী মায়ের পাইলস চিকিৎসা

গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। এ অবস্থায় কিছু বিশেষ বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। যেগুলো অত্য"ড় সতর্কতার সাথে বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে চিকিৎসা করা উচিত। অন্যথায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এরূপ একটি সমস্যা হচ্ছে গর্ভাবস্থায় মায়ের পাইলস আক্রা"ড় হওয়া।

গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে মায়েদের পাইলসে আক্রা"ড় হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা, অনেকের হয়, এ সমস্যা আগে থেকে ছিল কিন্তু এখন এটির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার গর্ভাবস্থার কারণে অনেকের এসমস্যা নতুন করে শুর" হতে পারে। এ অবস্থায় পাইলস হওয়ার উলে- খ্যযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কোষ্ঠকাঠিন্য, হরমোনের পরিবর্তন, জরায়ুর স্ফীতির জন্য পেটের ভিতরের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া যার কারনে রক্তচলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এমতাবস্থায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পাইলস বিনা অপারেশনে রক্ষনশীল চিকিৎসায় ভাল করা সম্ভব। প্রথমত আমরা আসছি কোষ্ঠ ব্যবস্থাপনায়। মল যাতে শক্ত না হয় এবং মলত্যাগে কষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য বেছে খাবার খেতে হবে যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়। আঁশ বা Fibre জাতীয় খাবার খেতে হবে যেমন শাকশব্জি, ফলমুল, ইসুপগুলের ভূষি। গর" এবং খাসীর মাংস কম খাওয়া ভাল।
এ ছাড়া প্রয়োজনে জুলাফ বা মল নরম করার ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষতিকর। এ ঔষধগুলো সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক মেয়াদে ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় অভ্যাসে পরিণত হবে। সিজ বাথ অর্থাৎ গরম পানির সেক দেয়ায় উপকার পাওয়া যায়। এটির নিয়ম হচ্ছে আধগামলা গরম পানিতে লবন দিয়ে নিতম্ব ডুবিয়ে ১০ মিনিট, দিনে ২-৩ বার বসে থাকতে হবে।

এতে যদি রোগীর উন্নতি না হয় তাহলে আমরা ইনজেকশন অথবা আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বিনা অপারেশনে এবং বিনা ব্যথায় এর চিকিৎসা করতে পারি। যেহেতু ইনজেকশনের সফলতা আশা ব্যঞ্জক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাই পাইলসের চিকিৎসায় নুতন দিগন্ড়ের উন্মোচন করে এমন ব্যবস্থা যেমন রিং লাইগেশন পদ্ধতি অত্য"ড় ফলপ্রসু হতে পারে।

রিংলাইগেশন পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে পাইলস এর চিকিৎসা করা হয়। এটি ডাক্তারের চেম্বারেই সম্ভব। কোনরূপ অবশ বা অজ্ঞান করার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসা পরবর্তী কিছু দিনের ভিতর পাইলসটি আপনা আপনি কেটে পড়ে যায়। পদ্ধতিটি প্রয়োগের সময় রোগী কোনরূপ ব্যথা অনুভব করেন না। আমাদের শরীরে যেহেতু তিনটি পাইলস রয়েছে অতএব কিছু দিন পরপর এটি ২-৩ বার করা প্রয়োজন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান পাইলস বিশেষজ্ঞ ডাঃ মারভিন এল করম্যান বলেন যে এপদ্ধতিতে চিকিৎসার সাফল্য এত চমৎকার যে ৮০% পাইলস রোগী এ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন।

পদ্ধতিটি প্রয়োগের পর কিছু বিশেষ বিশেষ ঔষধ ও উপদেশ দেয়া হয়। এজন্য কোনরূপ কর্মবিরতি বা ছুটি নেয়ার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসার পর রোগী রিকশা বা গাড়ীতে অনায়াসে কিছুক্ষন পরই বাসায় ফিরে যেতে পারেন।

এটি অত্যন্ড় লাভজনক কারন এটি সময়, ঝুঁকি ও অর্থের সাশ্রয় করে। এটি আন্র্জ্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে এটি অপারেশনের একটি যুক্তিসংগত সফল বিকল্প পদ্ধতি, এতে অপারেশনের ঝুকিগুলি একেবারেই নেই।

অপারেশন ঃ

অন্ড়ঃসত্বা অবস্থায় আমরা সাধারণত পাইলসের অপারেশন এড়িয়ে থাকি। তবে পাইলসের জটিলতা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে অপারেশন ছাড়া কোন বিকল্প নেই তখন অপারেশন করাই শ্রেয়। বিশিষ্ট পাইলস বিশেষজ্ঞ ডাঃ সালিবী ২৫ জন অন্ড়ঃসত্বা মায়ের পাইলস অপারেশন করে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ঐ গর্ভবর্তী মায়েদের বা তাদের সন্ড়ানদের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। তিনজন বাদে এ ২৫ জনের সকলেই গর্ভাবস্থার শেষ তিনমাসে ছিলেন। এদের একজনের শুধুমাত্র অপারেশন পরবর্তী রক্তপাত হয়েছিল। এথেকে আমরা এ সিদ্ধান্ড়ে আসতে পারি যে গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাইলস অপারেশনের কোন অতিরিক্ত ঝুঁকি নেই।

লিভার সিরোসিসেরর রোগীদের কি পাইলস বেশী হয়?

লিভার সিরোসিসে সাধারণত রক্ত বমি হয়। পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়ার সমস্য কম। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এই রোগের কারনে রোগীদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে না। অবশ্য এক্ষেত্রে পায়ুপথে অতিরিক্ত ফুলে ওঠা শিরার (Rectal varices) দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এটিকে পাইলসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। পাইলস ও রেকটাল ভ্যারিসেস সম্পূর্ণ আলাদা রোগ। ডাঃ হসকিং ১০০ জন সিরোসিস রোগীর উপর গবেষণা করে দেখেছেন যে শতকরা ৪৪ জনের পায়ুপথে ভ্যারিসেস (Anorectal varices) রয়েছে। অন্য এক গবেষণায় ডাঃ ঘোয়াংকা দেখিয়েছেন যে ৮৯% সিরোসিস রোগীর পায়ুপথে ভ্যারিসেস রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই রোগীদের শতকরা ৪১ জনের পাইলস বা হেমোরয়েড রয়েছে। এখানে উলে-খ্য যে সর্বসাধারণের অর্থাৎ যাদের লিভার সিরোসিস হয়নি তাদের ও শতকরা ৪১% জনের পরীক্ষা করলে পাইলস পাওয়া যাবে।

চিকিৎসা ঃ এ রোগে পায়ুপথে রক্ত গেলে পোর্টাল হাইপারটেনশন-এর চিকিৎসা করতে হবে এবং পায়ূপথে অপারেশন করে রক্ত বন্ধ করতে হবে, তবে এ অপারেশন পাইলসের অপারেশন নয়।

হার্টের রোগীর পাইলস

অনেকে আছেন পাইলসকে অবহেলা করেন। যদি পাইলস থাকা অবস্থায় কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাহলে হৃদরোগের চিকিৎসার পূর্বে পাইলস অপারেশন করে আসা প্রয়োজন। কারণ হৃদরোগ অপারেশনের পর রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধক ঔষধ খেতে হবে বহুদিন। তখন পাইলসের রক্ত যাওয়ার পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাবে। রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধকারী ঔষধের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এসপ্রিন, ডিসপ্রিন ও ইকোসপ্রিন। অনেক উচ্চ রক্তচাপের রোগীও এসপ্রিন, ডিসপ্রিন ও ইকোসপ্রিন জাতীয় ঔষধ নিয়মিত খাচ্ছেন। এগুলো দেয়া হয় হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য। ঔষধটি রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়। এমতাবস্থায় পাইলসের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা খুবই কষ্টকর। অতএব অবহেলা না করে সময় থাকতে পাইলসের চিকিৎসা করে নেয়া জর"রী।

রিং লাইগেশন পদ্ধতিঃ বিনা অপারেশনে ৮০% পাইলস চিকিৎসা

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে কয়েক আউন্স ভূষির অভাবে আজ ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হয়েছে। কারণ ওয়াটারলু এর যুদ্ধে নেপোলিয়ন পাইলসে আক্রান্ড় থাকায় সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হননি। খাদ্যে আশ জাতীয় খাবার কম থাকার কারণে নেপলিয়ন তীব্র পাইলস সমস্যায় ভুগছিলেন বলে এ উক্তি করা হয়েছে।

একজন রোগী পাইলস বলতে বোঝেন মলদ্বারের চুলকানি, চাকা হওয়া, ব্যথা, ফুলে যাওয়া, রক্ত পড়া, মলদ্বার ঝুলে পড়া ইত্যাদি। পাইলসের শিরাগুলি সাধারণভাবে সবার শরীরেই বিদ্যমান। পাইলসের উপসর্গগুলো পশ্চিমা সভ্যতায় খুবই সাধারণ। এ সমস্যাটি যে কোন বয়সে যে কোন লিংগেই হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ৪.৪% লোকের পাইলসের সমস্যা রয়েছে। পঞ্চাশোর্ধ লোকদের ৫০% কোন না কোন সময় পাইলসের উপসর্গ অনুভব করেন। উচ্চবিত্তের লোকদের এই রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কারণ ঃ পাইলস কোন বিশেষ একটি কারণের জন্য হয় না। অনেকগুলো কারন এজন্য দায়ী যার অন্যতম হচ্ছে উত্তরাধিকার, গঠনগত বৈশিষ্ট্য, পুষ্টি, পেশা, আবহাওয়া, মানসিক সমস্যা, বার্ধক্য, হরমোনের পরিবর্তন, খাদ্য ও ঔষধ, সংক্রমন, অন্ড্রুসত্বা, ব্যয়াম, কাশি, মলত্যাগে শক্তিপ্রয়োগ, বমি, আটঁ সাঁটে কাপড় পড়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেহের গঠনকে ধরে রাখার বিভিন্ন টিস্যু বা কলার ক্ষয় হতে থাকে যার কারনে মলদ্বারের ভিতরের কুশনটি ঢিলা হয়ে ঝুলে পড়তে থাকে। এমতাবস্থায় শীরাগুলো স্ফীত হতে থাকে এবং রক্তপাত হতে থাকে।

শ্রেণী বিন্যাস ঃ

ক) অবস্থানগত ঃ

১। বহিস্থিত
২। অভ্যন্ড়রীণ
৩। দুইটি সংমিশ্রণ

খ) ডিগ্রিগত বা ভয়াবহতা অনুযায়ী ঃ

প্রথম ডিগ্রী পাইলসে সাধারণ মলত্যাগের সময় রক্তপাত হয়। স্ফীতশীরাগুলো মলনালীর ভিতর ঝুলে পড়ে কিন্তু মলদ্বারের বাহিরে আসে না। দ্বিতীয় ডিগ্রী পাইলস মলত্যাগের সময় মলদ্বারের বাহিরে বের হয়ে আসে এবং নিজে নিজেই ভিতরে ঢুকে যায়। তৃতীয় ডিগ্রী পাইলস মলদ্বারের বাহিরে ঝুলে পড়ে এবং এটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। চতুর্থ ডিগ্রী পাইলস সব সময় মলদ্বারের বাহিরে ঝুলে থাকে। এদেরকে ভিতরে ঢুকানো যায় না।

উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ ঃ

এ রোগে রোগীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মলদ্বারে রক্ত পড়ার অভিযোগ করেন। এটি সাধারণতঃ মলত্যাগের সময় অথবা তার পরে হয়ে থাকে। মলত্যাগে শক্তিপ্রয়োগ করা অথবা বারে বারে মলত্যাগ করলে রক্ত যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যা কিনা কমোডে বা টয়লেট পেপারে দেখা যেতে পারে। অতিরিক্ত রক্ত যাওয়ার কারণে তীব্র রক্তশূণ্যতা দেখা দিতে পারে। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। কিন্তু যদি থ্রম্বসিস (রক্ত জমাট বাধা), ঘা, অথবা পচন ধরে তখন ব্যাথা হতে পারে। মলদ্বারে ব্যথার প্রধান কারণ এনাল ফিশার।
মলদ্বারের ভিতর থেকে মাংস পি ঁ ঝুলে পড়া বা গেজ হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। এটি হলে কখনো কখনো হাত দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এমন হতে পারে যে এটি বাহিরে ঝুলে আছে এবং কখনো ভিতরে যায় না। মাঝে মধ্যে মলদ্বারে চুলকানি হতে পারে। পাইলসের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। কিন্তু ঘনঘন পায়খানা হলে অথবা থ্রম্বসিস হলে অনেকে রক্তপড়া বা ব্যথার জন্য টয়লেটে যেতে চায়না যার জন্য আস্ড়ে আস্ড়ে কোষ্ঠ কাঠিন্য দেখা দেয়।

পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ

মলদ্বারে রক্তপড়ার অনেক কারণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে পায়ুপথের ক্যান্সার। বাংলাদেশ এবং সিংগাপুরে আমি এমন রোগী দেখেছি যারা পাইলস বা রক্ত আমাশয় বলে চিকিৎসা করেছেন অনেকদিন। কিন্তু উন্নতি না হবার কারণে পরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

সিগময়ডস্কপি ঃ মলদ্বার, পায়ুপথ ও বৃহদান্ত্রের ভিতরে এ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়।

প্রক্টস্কপি ঃ এ যন্ত্র দিয়ে মলদ্বার ও পায়ুপথের নিচের দিক পরীক্ষা করতে হয়। রোগী যদি ৫০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে হয় এবং যদি পরিবারে কারো বৃহদান্ত্র ক্যান্সারে আক্রান্ড় হয়ে থাকে তাহলে বেরিয়াম এনেমা বা কোলনস্কপি করা উচিত।

প্রতিরোধ ঃ কিছু অভ্যাস এবং উপদেশ পালন করলে পাইলস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আঁশ জাতীয় খাবার যেমন শাক শব্জি, ইসুপগুলের ভূষি এ ব্যাপারে উপকারী। আফ্রিকায় কিছু সম্প্রদায় আছে যারা মূলত ঃ শাকশব্জি ও ফলমূলের উপর নির্ভর করে এদের সাধারণত পাইলস দেখা যায় না। টয়লেটে অনেকক্ষন বসে বইপড়া বা অহেতুক দীর্ঘক্ষন বসে থাকা উচিত নয়। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়ার সময়মত যথাযথ চিকিৎসা করা উচিত। গর ঁ এবং খাসির মাংশ কম খাওয়া উচিত। ডায়রিয়া বা আমাশয়ের চিকিৎসা যথাসময়ে করিয়ে নেয়া উচিত।

চিকিৎসা ঃ

পাইলসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন চিকিৎসা রয়েছে। যদি কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় তার চিকিৎসা করতে হবে যেমন ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য। ক্যান্সার অথবা বৃহদান্ত্রের অন্য কোন রোগ আছে কিনা অবশ্যই দেখে নিতে হবে।

বিনা অপারেশ এবং বিনা ব্যথায় পাইলস চিকিৎসা ঃ

ইনজেকশন ঃ বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালের সাহায্যে ইনজেকশন তৈরী করে পাইলসের চিকিৎসা হচ্ছে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরে। মলদ্বারের ভিতর বিভিন্ন ধরনের সূঁচ ও সিরিঞ্জ সঠিক স্থানে ও পরিমানে এ ইনজেশন দিতে হয়। অন্যথায় মারাত্মক জটিলতার সম্ভাবনা থাকে। যেমন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, পায়ুপথের আংশিক পচে যাওয়া, প্রষ্টেষ্ট গ-ান্ডের প্রদাহ ইত্যাদি। বনাজী ও অন্যান্য স্বঘোষিত পাইলস চিকিৎসকের আনাড়ী চিকিৎসার কারণে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে দেখেছেন এ দেশের অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গত জানুয়ারী মাসে এরূপ একজন বয়স্ক শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে ইনজেকশন দিয়ে ভয়াবহ রক্তপাতের সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন এবং জর"রী ভিত্তিতে দুবার অপারেশন করে তাকে সারিয়ে তোলা হয়।

যে পাইলস বের হয়ে আসেনা সেগুলো ইনজেকশনে খুব ভাল ফল দেয়। ঝুলে পড়া পাইলসের ক্ষেত্রে ইনজেকশনে ভাল ফল আশা করা যায় না। বহিঃস্থিত পাইলস, রক্ত জমাট বাধা অথবা অন্যান্য সমস্যা যেমন গেজ, ভগন্দর অথবা ফিশার থাকলে ইনজেকশন ব্যবহার অনুচিত।

নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো পাইলসে প্রথমত ইনজেকশন দিতে হয়। এতে কাজ না হলে বিকল্প চিকিৎসা করা উচিত। বার বার ইনজেকশনে খুব ভাল ফল আশা করা যায় না। পাইলস বিশেষজ্ঞগণ গবেষণার পর এই সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হয়েছেন যে ইনজেকশন পদ্ধতি স্বল্প মেয়াদের জন্য সন্ড়োষজনক কাজ করে বিশেষ করে প্রথম ডিগ্রী পাইলসের ক্ষেত্রে।

আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বিনা অপারেশনে ৮০-৯০% পাইলস চিকিৎসা।

এ পদ্ধতিতে ছোট যন্ত্রের সাহায্যে পাইলসের চিকিৎসা করলে সপ্তাহ খানিকের ভিতর পাইলসের মাংশপি"টি সয়ংক্রিয়ভাবে কেটে পড়ে যায়। চিকিৎসার সময় বা পরে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যথা হয় না। রোগীকে অজ্ঞান বা অবশ্য করার প্রয়োজন নেই। প্রখ্যাত আমেরিকান সার্জন ডাঃ মারভিন এল করমান ও ডাঃ ডিএস ষ্টিনবার্গ এ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন যে এ পদ্ধতিটি আবিষ্কারের ফলে ৮০-৯০% রোগী বিনা অপারেশনে ভাল হয়েছে। চিকিৎসা ব্যায় খুবই কম। এ পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে এনেমা দিলে ভাল হয়। পায়ুপথের ভিতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হয়। যেহেতু আমাদের শরীরে প্রধান তিনটি পাইলস আছে অতএব সর্বোচ্চ তিনবার এরূপ চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে। দুবার চিকিৎসার মধ্যে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ ব্যবধান থাকতে হয়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক রোগী চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন।
এ পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে তীব্র ব্যথা হতে পারে। চিকিৎসার পরই রোগী বাসায় চলে যেতে পারে। কিছু সময় টয়লেট ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। চিকিৎসার পর কিছু বিশেষ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে হয় অন্যথায় অকৃতকার্যতার সম্ভাবনা থাকে।
এ পদ্ধতিটি বেশীরভাগ রোগীর জন্য অপারেশনের যুক্তিসংগত বিকল্প হিসাবে আন্ড়র্জাতিক ভাবে স্বীকৃত, প্রমানিত ও প্রচলিত। তবে ১০-২০% রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশনই সর্বোত্তম পদ্ধতি। গবেষণায় দেখা গেছে এটি ইনজেকশনের চেয়ে বহু গুনে উন্নত। ইনজেকশনের ফলাফল সাধারণতঃ ক্ষনস্থায়ী।

অপারেশন ঃ

সাধারণত ১০-২০% রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশন দরকার, যখন মলদ্বারের গঠনপ্রনালী ভীষনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যেমন বহিঃস্থিত পাইলস, ঘা, পচন ধরা, বিস্তৃত থ্রম্বোসিস, মলদ্বারের ভিতরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাংশপিন্ড **(Hypertrophied Papilla)** অথবা সাথে ফিশার থাকলে। অজ্ঞান না করে কোমরে ইনজেকশন **(Spinal anesthesia)** দিয়ে রোগী সজাগ অবস্থায় অপারেশন করা যায়। অপারেশনের ৬ ঘন্টা পর স্বাভাবিক খাবার দেয়া উচিত যাতে পরদিন রোগী স্বাভাবিক মলত্যাগ করতে পারে। দিনে ২ বার নিতম্ব লবনসহ গরম পানিতে ডুবিয়ে সেক দিতে হয় ১০ মিনিট ধরে। ব্যথা নাশক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপারেশনের পরে আবারও পাইলস ঃ

অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে অপারেশনের পর আবার পাইলস হয়। এটির কারন বহুবিধ। সঠিক সময়ের আগেই অপারেশন করা, অপারেশনের সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করা বা অপারেশনের সময় ছিল না কিন্তু এ পাইলসটির পরে উদ্ভব হয়েছে। এরূপ পাইলস সাধারণতঃ তীব্র হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করাই শ্রেয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাইলস ঃ

মহিলারা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শেষের দিকে অনেকেই পাইলসের সমস্যায় ভোগেন। তাদের অনেকের হয়ত আগে থেকেই ছিল কিন্তু এখন তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা নতুন করে শুরু হয়েছে। কারো কারো বেশী রক্ত যায় আবার কারো গেজ **(prolapse)** দেখা যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে সমস্যাটি বেশী হয়।

চিকিৎসাঃ এদের বেশীর ভাগই রক্ষণশীল চিকিৎসায় ভাল হয়। সঠিক কোষ্ঠ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। যেমন জুলাফ **(Laxative),** মল নরম করার ঔষধ এবং সিজ বাথ অর্থাৎ গরম পানিতে লবন দিয়ে নিতম্ব ডুবিয়ে ১০ মি রাখতে হয়। এরূপ দিনে ২-৩ বার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাইলসের ভিতর যদি রক্ত জমাট বেঁধে ব্যথা হয় অথবা অন্য জটিলতা শুরু হয় তবে অপারেশন করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাইলসের সংক্রমন, আলসার, গ্যাংগ্রীন বা অন্য সমস্যা যদি দেখা দেয় যার জন্য অন্য সময়ে অপারেশনের বিকল্প নেই সেক্ষেত্রে পরিষ্কার কোন সিদ্ধান্ত দেয়া মুশকিল।

ডাঃ আরজি সালিবী জুনিয়র ১২৪৫৫ জন অন্তঃসত্ত্বা রোগীর ভিতর ২৫ জনের পাইলস অপারেশন করেছেন। তাদের বেশীর ভাগেরই অপারেশন হয়েছে শেষ তিনমাসে। এই রোগীদের অথবা তাদের ভূমিষ্ঠ বাচ্চাদের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। একজনের শুধুমাত্র অপারেশন পরবর্তী রক্তপাত হয়েছিল। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে খুবই জরুরী হলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাইলস অপারেশন করা যায়।

পাইলস চিকিৎসা লেজার সার্জারী

অনেকের ধারণা পাইলসের বিনা অপারেশনের চিকিৎসায় লেজার ধ্বনন্ড়রী। কিন্তু আসলে লেজার দিয়ে পাইলস অপারেশন করা অনেকটা প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণ পাইলস অপারেশনের মতোই। পার্থক্য হচ্ছে এখানে লেজার বিম দিয়ে কাটা হয় এবং সাধারণ অপারেশনে ছুরি বা নাইফ দিয়ে কাটা হয়। লেজার দিয়ে অপারেশনের পর সাধারণ অপারেশনের মতোই ব্যথা হয়, ঘা শুকাতে সমান সময় লাগে এবং একই রকমের অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ লেজার অপারেশনে উন্নততর ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। ডাঃ নিকোলস -এর মতে লেজার সার্জারিতে কোন অতিরিক্ত সুবিধা নেই। বরঞ্চ ব্যয়বহুল যন্ত্র এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার। এ ছাড়া নিরাপত্তার জন্য চোখে গগলস পরতে হয়।

যাই হোক এ নতুন পদ্ধতি নিয়ে এখনই শেষ কথা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা হলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। তবে এ মুহূর্তে এটি স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এখনও পাইলসের চিকিৎসায় 'লেজার চিকিৎসা' কোন বিশেষ স্থান দখল করতে পারেনি।

ইনজেকশন পদ্ধতিঃ
বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসা

পাইলস চিকিৎসায় বহু ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার কল্যাণে এখন শতকরা নব্বই জনেরও বেশি রোগীকে বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করা সম্ভব। পাইলসের চিকিৎসাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) বিনা অপারেশনে; (দুই) অপারেশনে। বিনা অপারেশনে পাইলস চিকিৎসার বহু পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে 'রাবার রিং লাইগেশন পদ্ধতি। এরপর রয়েছে ইনজেকশনের পদ্ধতি।

প্রথমেই পাইলস চিকিৎসায় বহুল আলোচিত ইনজেকশন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। ১৮৬৯ সালে জন মরগ্যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম ইনজেকশনের সাহায্যে পাইলস চিকিৎসা করেন। তিনি পারসালফেট অব আয়রন ব্যবহার করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনজেকশন পদ্ধতির পাইওনিয়ার হচ্ছেন ডাঃ মিশেল। কিন্তু তিনি আমৃত্যু তার গোপন ওষুধের ফর্মুলাটি প্রকাশ করে যাননি। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি তার গোপন ফর্মুলাটি বিক্রি করে যান। ১৮৭৯ সালে শিকাগোর চিকিৎসক ডাঃ এন্ড্রুজ প্রথমবারের মত এই গোপন ফর্মুলাটি প্রকাশ করে বলেন যে, এই ইনজেকশনে ফেনল ব্যবহার করতে হয়।

এরপর ধীরে ধীরে ডাক্তারদের মধ্যে এই চিকিৎসার প্রসার ঘটে। ১৮৮৮ সালে ডাঃ এডওয়ার্ডস বৃটেনে একটি ইনজেকশন পদ্ধতি চালু করেন যাতে ফেনলের সঙ্গে গি- সারিন ব্যবহার করা হয়।

সতর্কতা ঃ পাইলস ইনজেকশন দেয়ার জন্য একই সিরিঞ্জ অনবরত ব্যবহার করলে তার মাধ্যমে মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে। যেমন হেপাটাইটিস বি-ভাইরাস যা ধীরে ধীরে লিভার ধ্বংস করে এবং এইডসের মতো ভয়াবহ রোগও ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে সিরিঞ্জ সম্পূর্ণ জীবাণূমুক্ত করে নিতে হবে অথবা একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

ইনজেকশনে কি ব্যবহার করা হয় ?

১৮৬৯ সালে যদিও পারসালফেট অব আয়রন ব্যবহার করা হয়েছিল, এখন ফেনলের সঙ্গে ভেজিটেবল অয়েল ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাজ্যে এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুইনুরাইড সলুশন ব্যবহার করা হয়। ইনজেকশন দেয়ার সময় রোগীর টের পাবার কথা নয়, ব্যথা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইনজেকশনের আগে ও পরে খাওয়া-দাওয়া, পায়খানা করা স্বাভাবিক থাকবে। ইনজেকশনের ফলে মিউকাস ঝিলি- র তলায় পাইলস শক্ত ও সংকুচিত হয়, ফলে পাইলসের ফুলে ওঠা মাংসপি"টি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায় এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক পাইলস ইনজেকশনের নামে বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। এটি ব্যবহারের ফলে তীব্র বিষক্রিয়ায় প্রচ" ব্যথা হয়, মলদ্বারে পচন ধরে, জ্বর আসে এবং দুর্গন্ধ হয়। এমতাবস্থায় জর"রী ভিত্তিতে চিকিৎসা না করলে পচন প্রক্রিয়া দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। অনেকের পরবর্তীতে মলদ্বার সংকুচিত হয়ে যাবার ফলে স্বাভাবিক মলত্যাগ করতে পারে না। কখনো কখনো মলদ্বার ও রেকটাম নষ্ট হয়ে যাবার কারণে পেটে কৃত্রিম মলদ্বার বা কলোষ্টমী করতে হয়।

কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়ে না এরূপ পাইলসে ইনজেকশন ভালো কাজ করে। যেসব ক্ষেত্রে ইনজেকশন ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ তার মধ্যে রয়েছে- বহিঃস্থিত পাইলস, আভ্যন্ড়রীণ পাইলস যখন সংক্রমিত অথবা থ্রম্বসিস হয়, পাইলসের সঙ্গে যখন ফিষ্টুলা, টিউমার বা এনাল ফিশার থাকে।
ইনজেকশন কতোবার দিতে হয়।

সব পাইলসে একই সঙ্গে ইনজেকশন দেয়া উচিত। এতে যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তা হলে অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। অনেক সময় রোগী বলেন যে, আমি প্রতি সপ্তাহে একটি করে মোট সাতটি ইনজেকশন নিয়েছি তবুও কাজ হচ্ছে না। কোথায় নিয়েছেন জিজ্ঞেস করলে বলেন যে, হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়েছি। বারবার ইনজেকশন দেয়ার জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমনঃ মলদ্বারে একটানা জ্বালাপোড়া। ডাঃ এসপি লেক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বারবার ইনজেকশন দিয়ে কোনো অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায় না। ডাঃ ডেনকার এক গবেষণায় পাইলস চিকিৎসার তিনটি পদ্ধতি যেমনঃ ইনকেজশন, রিংলাইগেশন ও অপারেশন- এর তুলনামূলক বিশে-ষণ করে এ সিদ্ধান্ড় উপনীত হয়েছেন যে, ইনকেজশন পদ্ধতির সাফল্য নিম্নমানের। এ কারণে তিনি মনে করেন যে, পাইলসের চিকিৎসায় ইনজেকশন পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা ঠিক নয়। ডাঃ আলেকজান্ডার উইনিয়ামস দীর্ঘদিন ইনজেকশন ও অন্যান্য পদ্ধতির পাইলস চিকিৎসা করে এ সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হয়েছেন যে, ইনজেকশন পদ্ধতি প্রথম ডিগ্রী পাইলসে স্বল্প মেয়াদে ভালো কাজ দেয়। এর সুফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ডাঃ মারভিন এল করম্যানের মতে প্রথম ডিগ্রী পাইলসেই ইনজেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত এবং প্রতিটি পাইলসে কেবল একবার ইনকেজশন দেয়াই যথেষ্ট, এরপরও যদি উপসর্গ না কমে তবে বিকল্প কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

শেষ কথা

মলদ্বারের রোগের উপসর্গগুলো বিভিন্ন রোগে প্রায় একই রকম। যেমন- রক্ত যাওয়া, ব্যথা বা চুলকানি হওয়া বা কষানি পড়া। ফলে রোগী সব কিছুকে পাইলস হয়েছে বলে মনে করেন। মলদ্বারের সাধারণ রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পাইলস, ফিশার, ফিষ্টুলা বা ভগন্দর ও ক্যান্সার। ডাক্তার ছাড়া রোগীদের পক্ষে এ রোগগুলো শনাক্ত করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, ইনজেকশন পদ্ধতি শুধুমাত্র পাইলস চিকিৎসার জন্য। অন্য রোগে সম্পূর্ণ নিষেধ। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতার প্রয়োজন। একবার ইনজেকশন দিয়ে ভালো না হলে বারবার ইনজেকশন দিয়ে অধিক সুফল পাওয়া যায় না বলে রেকটাম ও মলদ্বার সার্জারি বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মলদ্বার না কেটে অত্যাধুনিক পাইলস অপারেশনের বিস্ময়কর প্রযুক্তি - লংগো অপারেশন

জীবনে কম বেশী পাইলসের সমস্যায় ভোগেননি এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। পাইলস বলতে আমরা বোঝাই মলদ্বারে রক্ত যাওয়া, ব্যথা হওয়া, ফুলে ওঠা, মলদ্বারের বাইরে কিছু অংশ ঝুলে পড়া আবার ভিতরে ঢুকে যাওয়া ইত্যাদি। এর চিকিৎসা হিসাবে আদিকাল থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি চলে এসেছে যেমন ইনজেকশন পদ্ধতি, রিংলাইগেশন পদ্ধতি এবং অপারেশন। ইনজেকশন পদ্ধতি ১৮৬৯ সনে আমেরিকায় শুর হয়। এ পদ্ধতিটি প্রাথমিক এবং ছোট পাইলসে ভাল ফল দেয় কিন্তু সুফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এরপর ১৯৬২ সনে ইংল্যাে রিংলাইগেশন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়। রিংলাইগেশন পদ্ধতির ফলাফল খুব ভাল। ৮০-৯০ ভাগ পাইলস রোগী এপদ্ধতিতে ভাল হন। কিন্তু শতকরা ১০-২০ ভাগ রোগীর অপারেশন প্রয়োজন। বিশেষ করে যাদের পাইলস বড় হয়েছে এবং বাইরে বেরিয়ে আসে। এঅবস্থায় প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা অপারেশন করে থাকি। এ অপারেশনে মলদ্বারের চতুর্দিকে তিন জায়গায় বেশ কিছু জায়গা কেটে ফেলে দিতে হয়। যার ফলে অপারেশনের পর প্রচুর ব্যথা হয়, মলত্যাগের পর ব্যথা বেড়ে যায়, অনবরত সামান্য রক্ত ও পূঁজের মত নিঃস্বরণ হয়। যার ফলে ক্ষতস্থান শুকাতে ১-২ মাস সময় লাগে। অফিস থেকে কমপক্ষে একমাস ছুটি নিতে হয় অপারেশনের পর ক্ষেত্রভেদে মলদ্বার সংকুচিত হয়ে জীবন দুর্বিসহ করে তোলে আবার পায়খানা আটকিয়ে রাখার ক্ষমতা ব্যহত হতে পারে। এরূপ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রোগীকে এক থেকে দেড় মাস কাটাতে হতে পারে। মলদ্বারের চতুর্দিকের মাংস কাটার জন্য মলদ্বারের ভিতরের অনুভূতি কমে যায়। যার জন্য মল আটকে রাখার ক্ষমতার তারতম্য হতে পারে।

এহেন প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক ডাঃ এন্টনিও লংগো, অধ্যাপক সার্জারী, ইউনির্ভাসিটি অব প্যালেরমো, ইটালী ১৯৯৩ সালে একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার নাম Longo Operation বা Stapled Haemorrhoidectomy। অর্থাৎ অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মলদ্বার না কেটে পাইলস অপারেশন। এ পদ্ধতির Concept বা চিকিৎসার দর্শণ যুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে পাইলসটিকে একটি ঝুলেপড়া মাংশপি হিসাবে মনে করা হয়। এই ঝুলে পড়া মাংসপিের ভিতর অসংখ্য শিরা মলত্যাগের সময় প্রচ চাপে রক্তপাত ঘটায়। বিশেষ ধরনের যন্ত্রের (Hemorrhoidal circular stapler, Elthicone Endosurgery, USA) সাহায্যে অপারেশনের ফলে ঝুলেপড়া পাইলস ভিতরে ঢুকে যাবে। মজার ব্যপার হচ্ছে এ পদ্ধতিতে আসলে পাইলসের স্থানে বা মলদ্বারে কোন কাটা ছেড়া হয় না। সয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কাটা ছেড়া হয় তবে তা মলদ্বারের অনেক গভীরে। এই যন্ত্রটি রেকটামের ভিতর একটি চক্রাকার মাংসপি কেটে নিয়ে আসে। কাটা ছেড়া করে ঔ যন্ত্রটিই আবার সেলাইও সেরে দেয়। যার কারনে কোন ক্ষতস্থান থাকে না। আর ক্ষতস্থান থাকেনা বলে শুকাবার প্রশ্ন আসে না। মলদ্বারের অনেক গভীরে যে স্থানটির নাম রেকটাম সেখানে কোন ব্যথার অনুভূতি নেই। তাই এই অপারেশনের পর কোনরূপ ব্যথা হয় না। তবে মলদ্বারে কিছু নাড়াচাড়া করা হয়, যার ফলে অপারেশনের পর অল্প ব্যথা হতে পারে। এপদ্ধতিতে পাইলসের উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ রেকটামের ভিতর অপারেশনের ফলে পাইলসের রক্ত সরবরাহের শিরাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এপদ্ধতিতে গঠনগত দিক থেকে মলদ্বার সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে। মলদ্বারে সামান্যতম কোন কাটা ছেড়া নেই। এটিই এই

অপারেশনের নতুন দিক। যার কারণে অপারেশনের পর প্রচন্ড ব্যথা নেই। রক্ত বা পূঁজ পড়ার সমস্যা নেই। ক্ষতস্থান শুকাবার জন্য
দেড়মাস সময় দরকার নেই। মলদ্বার সরু হয়ে যাওয়ার সমস্যা নেই। দীর্ঘদিন ব্যথার ঔষধ ও এন্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘদিন বিশ্রাম বা ছুটি নেয়ার প্রয়োজন নেই। পায়খানা আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যহত হওয়ার ভয় নেই। সর্বোপরি আবার পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা অতি সামান্য অর্থাৎ শতকরা ২ভাগ।

এ অপারেশনে অজ্ঞান করা হয় না তবে কোমরের নিচের দিক অবশ করা হয়। অপারেশনের জন্য রোগীকে ২-৩ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। একটি অত্যাধুনিক বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় যেটি কিছুটা ব্যয় বহুল অর্থাৎ যন্ত্রটির মূল্য বিশ হাজার টাকা। কিন্তু এ পদ্ধতির সুবিধাগুলো পর্যালোচনা করলে প্রায় সব রোগীই এতটুকু ত্যাগ স্বীকারে রাজী হবেন। ৫-১০ দিনের মধ্যে রোগী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবেন। অন্যদিকে সাধারণ অপারেশন হলে রোগীকে এক থেকে দেড়মাস ছুটি নেয়া লাগতে পারে।

বিগত নয় বৎসর যাবত আমরা মলদ্বারের চিকিৎসা করে আসছি এবং এ পর্যন্ত ৬৬৬৩৫ রোগীর চিকিৎসা ও অপারেশন করেছি। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়ায় এ রোগের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি। আমাদের দেশের রোগীরা ২০-৪০ বৎসর পাইলস নিয়ে ভোগেন কিন্তু অপারেশনের পরের যন্ত্রণার কথা ভেবে ভয়ে কোন ডাক্তারই দেখান না।

বিগত ৮ই জুন ২০০৩ সালে আমি প্রথম এই অত্যাধুনিক অপারেশন সাফল্যের সাথে বাংলাদেশে সম্পাদন করি। এরপর বিগত দুই বৎসরে আমরা এজাতীয় কয়েক শত অপারেশন করে খুবই ভাল ফলাফল পেয়েছি। অল্প কিছু রোগীর সামান্য সমস্যা হয়েছে। জনৈক রোগী অপারেশনের পর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন– স্যার, বিশ বৎসর ভয়ে অপারেশন করলাম না। এখন মনে হচ্ছে এটি কোন অপারেশনই না। আত্মীয় স্বজন বলেন তোমার কি আসলেই অপারেশন হয়েছে? কোন ব্যথা নেই, রক্ত পড়া নেই, গরম পানির সেক দেয়া নেই ইত্যাদি। বিদেশে যেখানে এজাতীয় অপারেশনে কয়েক লাখ টাকা খরচ হবে সে তুলনায় আমাদের দেশে খরচ অত্যন্ত সীমিত। আমি মনে করি সব মধ্যবিত্তের আওতায় থাকবে। রোগীরা পাইলস অপারেশন করতে চান না কয়েকটি কারনে যেমন অপারেশনের পর মলত্যাগে ব্যথা হওয়া, ঘা শুকাতে দীর্ঘদিন লাগা, দীর্ঘদিন বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন, পায়খানা আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যহত হওয়ার ভয়, মলদ্বার সরু হয়ে যাওয়ার ভয় এবং পাইলস আবার হওয়ার ভয় ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে এ জাতীয় সব সমস্যার পূর্ণ সমাধান রয়েছে।

দুই পদ্ধতির তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা

ক্র.নং	বিবরণ	লংগো অপারেশন	প্রচলিত পদ্ধতি
১।	মলদ্বারে কাটা ছেড়া	নাই	কাটা ছেড়া করতে হবে
২।	ব্যথা	সামান্য ব্যথা	প্রচুর
৩।	মলত্যাগের পর ব্যথা	সামান্য ব্যথা	প্রচুর
৪।	নিঃসরণ, রক্ত বা পূঁজ পড়া	নাই	এক থেকে দেড় মাস
৫।	রক্ত পড়া	নাই	মাঝে মধ্যে
৬।	অপারেশনের সময়	কিছুটা কম	কিছুটা বেশী
৭।	গরম পানির সেক দেয়া	প্রয়োজন নেই	বহুদিন দিতে হয়
৮।	ব্যথার ঔষধ	অল্প প্রয়োজন	বহুদিন খেতে হবে
৯।	এন্টিবায়োটিক	দরকার	দরকার
১০।	ছুটি নিতে হবে	৭-১০ দিন	কম বেশী ৩০ দিন
১১।	হাসপাতালে থাকতে হবে	২-৩ দিন	৩-৫ দিন
১২।	অপারেশনের পর সেওে উঠা	দ্রুত	দীর্ঘদিন লাগে
১৩।	মলদ্বার সরু হয়ে যাওয়া	হয় না	মাঝে মধ্যে হয়
১৪।	ভবিষ্যতে আবার পাইলস হওয়া	হয়না	৩%
১৫।	মলদ্বারের আকৃতি	স্বাভাবিক থাকে	স্বাভাবিক থাকে না
১৬।	আলিশ বা পায়ুপথ বের হয়ে আসা	এ পদ্ধতিতে আলিশ রোগের চিকিৎসা সম্ভব	সম্ভব নয়
১৭।	খরচ	বেশী (একবার ব্যবহার যোগ্য যন্ত্রের কারনে)	আগের মত, কম
১৮।	রোগীর সন্তুষ্টি	অনেক বেশী	কম
১৯।	পায়খানা ধরে রাখার ক্ষমতা	স্বাভাবিক	ব্যহত হতে পারে

চিকিৎসকের দৃষ্টিতেঃ পাইলস, ফিষ্টুলা না ক্যান্সার?

পাইলস রোগটি আমাদের দেশের সাধারণ রোগীদের কাছে পরিচিত একটি রোগ। সর্বসাধারণের ধারণা পায়ুপথের বিভিন্ন সমস্যা যেমন রক্ত যাওয়া, ব্যথা হওয়া, ফুলে যাওয়া– এসবই হয় পাইলস রোগের কারণে। কিন্তু আসলে এ ধারণা সঠিক নয়। উপরোক্ত প্রতিটি উপসর্গই পায়ুপথে ক্যান্সার হলে হতে পারে। আবার ফিষ্টুলা বা ভগন্দর রোগেও উপরোক্ত উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে। আবার এমন হতে পারে যে, প্রথমতঃ পায়ুপথে ক্যান্সার হয়েছে সেটিও ফিষ্টুলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, যেমন ইতোমধ্যেই লেখক একজন রোগীর(৬৫) অপারেশন করেছেন ফিস্টুলা হিসেবে কিন্তু মাংস পরীক্ষা (বায়োপসি) রিপোর্টে দেখা গেল ক্যান্সার। এই ফিস্টুলা রোগীটির যে ক্যান্সারের কারণেই ফিস্টুলা হয়েছে তা অপারেশনের পূর্বে কোন পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছে শুধুমাত্র অপারেশনের পর নিয়মিত মাংস পরীক্ষার রিপোর্টে। যদি ভুলক্রমে বা কোনভাবে এ রোগীর বায়োপসি না করা হত তাহলে তার ক্যান্সার ধরা পড়ত অনেক দেরীতে যখন চিকিৎসার অযোগ্য হত। আশার কথা এই যে, লেখক মোটামুটি সব ফিস্টুলা রোগীর নিয়মিত মাংস পরীক্ষা করে থাকেন। এ রোগীর ইতিহাস নিয়ে দেখা যায় তিনি নিজে একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। ৪ বছর ধরে তার এই সমস্যা চলছে এবং তিনি নিজে চিকিৎসক বলে হোমিও ঔষধ খেয়ে যাচ্ছেন। তার মলদ্বার থেকে দূরে একটি মুখ থেকে পুঁজ ও রক্ত পড়ত। এটিকে সাধারণ ফিস্টুলা মনে করে তিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে ঔষধ খাচ্ছিলেন। বেশির ভাগ ফিস্টুলা রোগীর ক্যান্সার থাকে না। পায়ুপথের ক্যান্সার যখন দীর্ঘদিন চিকিৎসাবিহীন থাকে তখন এটি মলদ্বারের পাশে ছিদ্র হয়ে বের হয়ে আসে এবং সেখান থেকে পুঁজ যায় আবার কখনো কখনো রক্ত যায়।

লেখকের দেখা অন্য একজন মহিলা রোগী (৫৫) যিনি রাজধানীর একটি কলেজের অধ্যাপক গত দেড় বছর যাবত মলদ্বারে রক্ত যাচ্ছে। পায়খানা ক্লিয়ার হয় না। নিজে নিজে ল্যাক্সেনা ট্যাবলেট খাচ্ছেন পেট পরিস্কার করার জন্য। পায়খানার বেগ আসলে কিছু তরল জিনিস বের হয়ে আসে কিন্তু পায়খানা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এরূপ ভাব। মাঝে মাঝে টয়লেটে রক্ত যায়। ইদানিং মলদ্বারে ও কোমরের নিচের দিকে ব্যথা মলদ্বার থেকে পিছন দিকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা। এখানে উলে-খ্য যে, ভেতরের ব্যথা কোমরে অনুভূত হতে পারে আবার উর"র দিকেও সম্প্রসারিত হতে পারে।

এই রোগীনির প্রাথমিক ইতিহাস শোনার পর লেখকের স্বাভাবিকভাবেই একটু সন্দেহ হয়েছে। অতঃপর তার সিগময়ডস্কপি ও প্রকটস্কপি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তার রেকটামের ভেতর ক্যান্সার আছে। কিন্তু রোগীর বিশ্বাস তিনি পাইলসে ভুগছেন। বিস্ড়ারিত ইতিহাস না নিলে ভুল হত। কারণ রোগীর সাদামাটা বক্তব্য হচ্ছে যে তার রক্ত যায় এবং পায়খানা ক্লিয়ার হয় না। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে রোগীরা মলদ্বারের ভেতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করাতে চান না। ব্যথা হতে পারে এই ভেবে খুব ভয় পেয়ে যান। জিজ্ঞাস করেন যে, এই পরীক্ষা করলে আমি আগামীকাল অফিসে যেত পারব কিনা? এটি নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এ পরীক্ষায় সামান্য অস্বস্ড়ি ছাড়া কোনরূপ ব্যথা হয় না। বেশির ভাগ রোগীই এ পরীক্ষায় কোনরূপ ব্যথা পান না। এ পরীক্ষার জন্য খুবই সামান্য সময়ের প্রয়োজন। সারাদিন না খেয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না। মলদ্বারে তীব্র ব্যথা আছে এমন রোগীদেরও এ পরীক্ষা করা যায়।

সম্মানিত রোগীদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই যে, উপরোক্ত সমস্যা দেখা দিলে সবারই ক্যান্সার হয়েছে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেসব রোগে পায়খানার সাথে রক্ত যায় তার মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রক্ত যায় যেসব রোগে সেগুলো হচ্ছে (১) এনাল ফিসার (২) পাইলস (৩) রেকটাল পলিপ (শিশুদের বেশি হয়) (৪) ক্যান্সার (৫) আলসারেটিভ কেলোইটিস (৬) ফিস্টুলা ও অন্যান্য।

আমরা মফস্বল থেকে আসা অনেক রোগী দেখি যাদের ক্যান্সার আছে অথচ হাতুড়ে চিকিৎসকরা তাদেরকে ইনজেকশন দিচ্ছেন। কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক আবার একধাপ এগিয়ে সেখানের অপারেশনেরও মহড়া দিচ্ছেন। আবার কখনো কখনো একই রোগীর পাইলস ও ক্যান্সার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি পাইলসের চিকিৎসা করি তাহলেও দেখা যায় যে রোগীর সমস্যা যাচ্ছে না, তখন মলদ্বারের ভেতর লম্বা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা (সিগময়ডস্কপি বা কোলনস্কপি) করলে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এ জাতীয় সমস্যাও মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

মোট কথা, মলদ্বারের মুখ থেকেও রক্ত যেতে পারে আবার অনেক ভিতর অর্থাৎ রেকটাম বা বৃহদান্ত্রের (Colon or large intestine) ভিতর থেকেও রক্ত যেতে পারে। কি কারণে যাচ্ছে তা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক বলে দিতে পারেন। কিছু কিছু রোগী বলেন যে, আমার পাইলস হয়েছে আমাকে কিছু ঔষধ দেন খেয়ে দেখি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার নেই। কিন্তু লেখক বিশেষ ধরনের পরীক্ষা না করে অনুমান নির্ভর পাইলস চিকিৎসার বিপক্ষে। কারণ এতে যে রোগীদের ক্যান্সার আছে তা সনাক্তকরণে বিলম্ব হবে। বিলম্বিত চিকিৎসায় ক্যান্সারে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না।

মলদ্বারের ব্যথা ও এনাল ফিশারঃ
এই গোপন কষ্টের আধুনিক চিকিৎসা

মলদ্বারের ব্যথায় অনেক লোক ভুগে থাকেন। ফিশার মানে মলদ্বারে ঘা অথবা ফেটে যাওয়া। এটি দুই ধরনের হয়। তীব্র (একিউট) ফিশার হলে রোগীর মলদ্বারে অসম্ভব ব্যথা হয়। দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) ফিশারে ব্যথার তারতম্য হয়। এটি যে কোন বয়সে হতে পারে। তবে তর"ণ ও যুবকদের বেশি হয়। পুর"ষ অথবা নারী উভয়েরই এটি সমানভাবে হয়ে থাকে।

কারণ এবং কি ক'রে ঘটে?

এটি হওয়ার জন্য সাধারণত দায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা মলত্যাগের সময় কোত দেয়া। এ ছাড়া শক্ত মল বের হওয়ার সময় মলদ্বার ফেটে যায় বলে মনে করা হয়। যারা আঁশযুক্ত খাবার খান তাঁদের এ সমস্যাটি কম হয় বলে মনে করা হয়। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে রয়েছে শাকসবজি কাঁচা ফলমূল, আলুর ছোলা, ইসবগুলের ভূসি ইত্যাদি। চা-কফি বা মদ খাওয়ার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। ঘন ঘন মলত্যাগ বা ডায়রিয়া হলে ফিশার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা মলদ্বারের ভিতরের চাপ মেপে দেখেছেন। ফিশারে চাপ তেমন একটা বাড়ে না যদিও আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে মলদ্বার অতিরিক্ত সংকুচিত বলে মনে হয়।

উপসর্গঃ

মলদ্বারে ফিশারের প্রধান লক্ষণ হলো - ব্যথা ও রক্তক্ষরণ। এ ধরনের ব্যথা সাধারণত মলত্যাগের অব্যবহিত পরে হয় এবং কয়েক মিনিট থেকে বহু ঘণ্টা ধরে ব্যথা চলতে পারে। 'প্রকটালজিয়া ফুগাক্স' নামক এক ধরনের রোগেও মলদ্বারে ব্যথা হয়, কিন্তু সে ব্যথা মলত্যাগের সাথে সংশি- ষ্ট থাকে না। রক্তজমাট বাধা পাইলসেও ব্যথা হয়, কিন্তু তখন রোগী মলদ্বারে চাকা আছে বলে অভিযোগ করে।

এই রোগে রক্তক্ষরণের পরিমাণ সাধারণত কম। কিন্তু কারো কারো অতিরিক্ত রক্ত যেতে পারে। আমি অল্পবয়সী এক অফিসারকে এরূপ উপসর্গসহ চিকিৎসা করেছি তার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তীব্র রক্ষশূন্যতা হয়েছিল।

দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) এনাল ফিশারের রোগী একটু ভিন্ন ধরনের উপসর্গের কথা বলে। তারা কখনও কখনও তাদের মলদ্বারে অতিরিক্ত মাংসপি", পুঁজ পড়া, চুলকানি অথবা এসব একত্রে হয়েছে বলে অভিযোগ করে। এ ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। ব্যথা সাধারণত তীব্র হয় না অথবা অনেক সময় ব্যথা থাকেই না।
ফিশারের রোগীরা অনেক সময় প্রস্রাবের সমস্যায় ভোগেন এবং মহিলারা কখনো কখনো যৌন মিলনে বেদনা অনুভব করেন; যদিও রোগীরা বুঝতে পারেন কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণেই এমন হয়েছে তবুও যখন ব্যথা শুর" হয় তখন রোগী ভয়ে টয়লেটে যেতে চান না এবং মলত্যাগের বেগ হলে তাতে ব্যথার ভয়ে সাড়া দিতে চান না।

তীব্র ব্যথা সম্পন্ন ঘা (একিউট ফিশার)

এ সময় মলদ্বার পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেটা খুবই সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে। তীব্র ব্যথার কারণে মলদ্বারের ভিতরের ঘা-টি দেখা দুঃসাধ্য। কোন যন্ত্রও প্রবেশ করানো যায় না। অবশ্য সরু যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথাসম্পন্ন ঘা (ক্রনিক ফিশার)

ক্রনিক ফিশার বলা হয় যখন একটি সঠিকভাবে চিহ্নিত সীমানার মধ্যে ঘা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি মাংসপিণ্ড বা 'গেজ' দেখা যায়। মলদ্বারের ভিতরেও একটি মাংসপিণ্ড (Hypertrophied anal papilla) দেখা যেতে পারে যাকে অনেকে টিউমার বলে ভুল করে। এ ক্ষেত্রে পায়ুপথের ভিতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত যাতে টিউমার বা প্রদাহজনিত কারণ চিহ্নিত করা যায়। এ ফিশার সংক্রমিত হয়ে কখনও কখনও ফোঁড়া দেখা দিতে পারে এবং তা থেকে ফিস্টুলা (ভগন্দর) হয়ে পুঁজ পড়তে পারে।

প্রতিরোধ

কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং বেশি শক্তি প্রয়োগ করে মলত্যাগ করা উচিত নয়। বারে বারে মলত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করা এবং ডায়রিয়ায় দ্রুত চিকিৎসা করা উচিত।

চিকিৎসাঃ
রক্ষণশীল চিকিৎসাঃ

একিউট ফিশার শুরুর অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা হলে বিনা অপারেশনে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মল নরম করার, মলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আঁশযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া উচিত এবং ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। সিজ বাথ নিলে উপকার হয়। এটির নিয়ম হচ্ছে আধ গামলা লবণ মিশ্রিত হালকা গরম পানির মধ্যে নিতম্ব ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়। স্থানিক অবশকারী মলম ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। এতে যদি পুরোপুরি না সারে এবং রোগটি যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে অপারেশন ছাড়া ভাল হবার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

সার্জিকাল চিকিৎসাঃ

মলদ্বারের মাংসপেশীর সম্প্রসারণ করা (এনাল ডাইলেটেশন) - এ পদ্ধতিটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য বেশিরভাগ সার্জন এটির বিপক্ষে। এ পদ্ধতির জন্য কোন কোন রোগীর মল আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যহত হতে পারে।

মলদ্বারের স্ফিংটারে অপারেশনঃ

এই অপারেশনে মলদ্বারের অভ্যান্তরীন স্ফিংটার মাংশপেশীতে একটি সূক্ষ্ম অপারেশন করতে হয়। অজ্ঞান করার প্রয়োজন নেই। দুই দিনের মধ্যেই রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। অপারেশনের তিন দিন পর স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের রোগীরা অনেক দেরী করে অপারেশন করান। যার কারনে অনেক বেশী কাটাছেঁড়া করার কারণে তাড়া তাড়ি কাজে ফিরে যেতে পারেন না।

মতামত ঃ

বিগত ৯ বৎসরে মলদ্বারের সমস্যায় আক্রান্ড় ২৯,৬৩৫ জন রোগীর উপর গবেষনা করে দেখেছি যে ৩৫.০% রোগী এনাল ফিশারে আক্রান্ড়। আমার দেখা এনাল ফিশার রোগীদের ৭৬.৫৭% বিনা অপারেশনে বিভিন্ন ঔষধ ও উপদেশের সাহায্যে ভাল হয়েছেন এবং ২৩.৪৩% রোগীদের অপারেশন করেছি। এ রোগীদের ৯৭% সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছেন। বাকী ৩% কমবেশী উপকার পেয়েছেন কিন্তু কারো কারো সামান্য অসুবিধা মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েছে। এ অপারেশনে আমরা রোগীকে অজ্ঞান না করে শরীরের নীচের দিক অবশ করে অপারেশন করেছি। রোগী সম্পূর্ণ সজাগ থেকেছেন। যারা অজ্ঞান হতে চেয়েছেন তাদের অজ্ঞান করা হয়েছে। এ অপারেশনের জন্য রোগীদের ২-৩ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। অপারেশনের পর রোগীদের মলত্যাগ করতে সবাই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন। অপারেশনের কিছু দিন পর ঘা শুকাবার পর শক্ত পায়খানা হলেও কেউ মলত্যাগের পর ব্যথা অনুভব করেন নি। এই অপারেশনের পর কারও মল আটকে রাখতে অসুবিধা হয়নি। তবে সঠিক পদ্ধতিতে অপারেশন করতে ব্যর্থ হলে মল ধরে রাখতে অসুবিধা হতে পারে। এনাল ডাইলেটেশন করলে পায়খানা আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যহত হতে পারে এবং রোগটি আবার দেখা দিতে পারে। সে কারণে আমি কখনই Anal dilatation বা Stretching করি না।

মলদ্বারের ব্যথা ও এনাল ফিশারের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা

মলদ্বারের ব্যথায় অনেক লোক ভুগে থাকেন। যে রোগে মলদ্বারে ব্যথা বা জ্বালাপোড়া হয় তার নাম এনাল ফিসার। সাধারণত শক্ত মল হলে বা ঘন ঘন মলত্যাগের কারণে মলদ্বার ফেটে ঘা হয়ে যায়। সমস্যা হল এই যে এই ঘা শুকাতে চায় না সহজে। আবার কিছু কিছু রোগীর এই ঘা শুকিয়ে গেলেও কিছু দিন পর আবার মল শক্ত হলে একই সমস্যা আবার দেখা দেয়। এই রোগ একজন রোগীর বৎসরের পর বৎসর এমনকি ৩০-৪০ বৎসর থাকতে দেখেছি। এ রোগের উপসর্গের ও বেশ তারতম্য হয়। কোন কোন রোগীর মলত্যাগের পর সামান্য জ্বালা পোড়া হয় এবং তা ৫ থেকে ১৫ মিঃ পর্যন্ড় চলে। আবার কখন কখন ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করে এবং কয়েক ঘন্টা এমনকি সারাদিন চলতে থাকে। কারো কারো মাথা ধরে যায়। আবার দীর্ঘস্থায়ী এনাল ফিসারে মাঝে মাঝে মোটেই ব্যথা থাকে না। আমার ব্যক্তিগত মতে মলদ্বারে রোগের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি হয়। জনসাধারণ এ রোগটিকে সাধারণতঃ পাইলস হয়েছে বলে মনে করে থাকেন। এটি যে কোন বয়সে হতে পারে। আমি দেড় মাসের বাচ্চাকে এ রোগ হতে দেখেছি। তবে তর"ণ ও যুবাদের বেশী হয়। পুর"ষ অথবা নারী উভয়ের এ রোগটি সমান ভাবে হয়ে থাকে।

কারণ এবং কি করে ঘটে ?

এটি হওয়ার জন্য সাধারণত ঃ দায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা মলত্যাগের সময় কোত দেয়া। শক্ত মল বের হওয়ার সময় মলদ্বার ফেটে যায় বলে মনে করা হয়। যারা আঁশযুক্ত খাবার খান তাদের এ রোগ কম হয়। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে রয়েছে শাকশব্জি, কাঁচা ফলমূল, আলুর ছোলা, ইসুপগুলের ভূষি ইত্যাদি। চা কফি বা মদ খাওয়ার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। ঘন ঘন মলত্যাগ বা ডায়রিয়া হলে ফিসার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যদিও আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে মলদ্বার অতিরিক্ত সংকুচিত বলে মনে হয়। মলদ্বারের ভিতর সাপোজিটরী জাতীয় ঔষধ দেয়ার সময় অনেকের মলদ্বারে যে ঘা হয় তা থেকেও অনেক রোগীর বিশেষ করে মহিলাদের এজাতীয় রোগ হতে দেখেছি।

উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ ঃ

মলদ্বারে ফিসারের প্রধান লক্ষণ হল ব্যথা, জ্বালাপোড়া ও রক্তক্ষরণ। এ ধরনের ব্যথা সাধারণত মলত্যাগের অব্যবহিত পরে হয় এবং কয়েক মিনিট থেকে বহু ঘন্টা এমনকি সারাদিন ও চলতে পারে। 'প্রকটালজিয়া ফিউগাক্স' নামক এক ধরনের রোগেও মলদ্বারে ব্যথা হয় কিন্তু তা মলত্যাগের অব্যবহিত পরেই হয় না, দিনের যে কোন সময় হতে পারে। পাইলসের জটিলতা যেমন রক্ত জমাট বাধা, আলসার বা গ্যাংগ্রীন হলেও মলদ্বারে প্রচুর ব্যথা হয় কিন্তু তখন রোগী মলদ্বারে বড় একটি মাংশপিন্ড আছে বলে অভিযোগ করেন। মলদ্বারে সংক্রমন হয়ে ফোড়া হলে, ফিষ্টুলা বা ভগন্দর এবং দুরারোগ্য ক্যান্সারেও ব্যথা হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগের ইতিহাস ও রোগীকে ফিজিক্যাল পরীক্ষা করে রোগ সনাক্ত করতে হয়।

এই রোগে রক্তক্ষরণের পরিমাণ সাধারণতঃ কম। তবে আমি অনেক রোগী দেখেছি যারা বলেন মুরগী জবাই করলে যেরূপ রক্ত পড়ে তেমন রক্ত যায়। কিছুদিন পূর্বে অল্প বয়সী এক অফিসারকে চিকিৎসা করেছি যার তীব্র রক্ত শূন্যতা হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) মলদ্বারের ফিসারের রোগী একটু ভিন্ন ধরনের উপসর্গের কথা বলেন। তাদের অভিযোগের মধ্যে থাকে মলদ্বারে অতিরিক্ত মাংশপিন্ড, পুঁজ পড়া, চুলকানি ইত্যাদি। এসব উপসর্গ একত্রে অথবা আলাদা আলাদাভাবে হতে পারে। এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। ব্যথা সাধারণতঃ তীব্র হয় না আবার অনেক সময় ব্যথা একেবারেই থাকে না।

ফিসারের রোগীরা অনেক সময় প্রস্রাবের সমস্যায় ভোগেন। অনেকে বহুদিন ধরে প্রস্রাব করতে কষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। জয়পুরহাটের একজন ডাক্তার দীর্ঘ ১৭ বৎসর যাবৎ ফিসারে ভুগছিলেন। তিনি মলত্যাগের সমস্যার পাশাপাশি প্রস্রাবেও কষ্ট পাচ্ছিলেন। অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা মুত্রনালীর অপারেশন করিয়েছেন। খুব উপকার হয়নি। ইন্ডিয়া গিয়ে দেখিয়েছেন। সম্পূর্ণ ভাল হননি। আমি এনাল ফিসারের অপারেশন করার পর প্রস্রাব করতে সমস্যা হচ্ছে না বলে জানান। এরূপ আরো অনেক .রোগী রয়েছেন।

এ রোগে মহিলারা কখনো কখনো যৌন মিলনে ব্যথা অনুভব করেন। যদিও রোগীরা বুঝতে পারেন যে কোষ্টকাঠিণ্যের কারণে এ সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে তবু ব্যথার ভয়ে রোগীরা টয়লেটে যেতে চান না। এভাবে কোন কোন রোগী ৫-১০ দিন পর একবার টয়লেটে যান। আবার এরূপ একটি রোগী পেয়েছি যাদের অতিরিক্ত মল আটকে রাখার কারণে মলত্যাগ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এবং মল চুইয়ে পড়ে কাপড় নষ্ট হয়। তখন রোগী বলেন যে আমি মল ধরে রাখতে পারছি না। আসলে সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে এমনটি হবার কথা নয়।

তীব্র ব্যথা সম্পন্ন ঘা বা **Acute anal fissure:**

এ অবস্থায় রোগীরা ভীষণ ব্যাথায় ভোগেন। কয়েক ঘন্টা থেকে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকেন। এসময় মলদ্বার পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সেটি খুবই সংকুচিত অবস্থায় আছে। তীব্র ব্যথার কারণে ভিতরের ঘা দেখা দুঃসাধ্য। কোন যন্ত্রও প্রবেশ করানো যায় না। অনেক রোগী তীব্র ব্যথার জন্য মলদ্বার স্পর্শ করতে দিতে চান না।

দীর্ঘস্থায়ী মলদ্বারের ঘা বা **Chronic anal fissure:**

ক্রনিক ফিসার বলা হয় যখন একটি সঠিকভাবে চিহ্নিত সীমানার মধ্যে ঘা দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি বাড়ন্ড় মাংশপিন্ড বা গেজ দেখা যায়। এটিকে বলা হয় 'সেন্টিনেল পাইলস'। মলদ্বারের ভিতরেও একটি টিউমারের মত মাংশপিন্ড দেখা যায় তাকে বলা হয় Hypertrophied anal papilla। এটি কোন ক্যান্সার বা টিউমার নয়। এক্ষেত্রে পায়ুপথের ভিতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত যাতে টিউমার বা প্রদাহজনিত কারণ চিহ্নিত করা যায়। এই ফিশার সংক্রমিত হয়ে কখনো কখনো ফোঁড়া দেখা দিতে পারে এবং তা থেকে ফিষ্টুলা (ভগন্দর) হয়ে পূঁজ পড়তে পারে। এ ঘা থেকে সব সময় কিছু রস নিঃসরন হওয়ায় চুলকানি দেখা দিতে পারে।

প্রতিরোধ **(Prevention) :**

কোষ্ঠকাঠিণ্য যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং বেশী শক্তি প্রয়োগে মলত্যাগ করা উচিত নয়। বারে বারে মলত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এবং ডায়রিয়া হলে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসা ঃ

রক্ষণশীল চিকিৎসা ঃ

রোগটি শুর“র অল্প দিনের ভিতরে চিকিৎসা শুর“ করা হলে বিনা অপারেশনে ভাল হবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রথম প্রথম সামান্য জ্বালাপোড়া এবং একটু রক্ত ক্ষরণ ছাড়া তেমন সমস্যা থাকে না তাই কেউ ডাক্তারের কাছে যান না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি রোগটি যখন বারে বারে হচ্ছে এবং ব্যথা কিছুটা তীব্র হচ্ছে তখনই ডাক্তারের কাছে আসেন। ততক্ষণে রোগটি ক্রনিক হয়ে গেছে। এরপরেও আমি ঔষুধ দিয়ে ১ মাস সেবন করতে বলি। যদি ভাল হয়ে যান তাহলে বিশেষ ধরনের খাবারের উপদেশ দিয়ে বলি যদি কোন দিন অসুবিধা হয় তাহলে আসবেন। কিন্তু ১ মাস বা দু' মাসের ঔষুধেও যদি ভাল না হয় তখন অপারেশন করতে উপদেশ দেই।

ঔষধের মধ্যে রয়েছে মল নরম করার এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ঔষধ। এজন্য আঁশ জাতীয় খাবার যেমন শব্জি, টাটকা ফলমুল ইসুপগুলের ভূষি খাওয়া যেতে পারে। ব্যথা নাশক ঔষধ খাওয়া যেতে পারে। সিজ বাথ (Sitz bath) নিলে উপকার পাওয়া যায়। এটির নিয়ম হচ্ছে আধ গামলা লবণ মিশ্রিত গরম পানিতে নিতম্ব ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। মলদ্বারে ব্যথানাশক মলম ব্যবহার করতে হয়। এতে যদি পুরোপুরি উপকার না পাওয়া যায় এবং রোগটি যদি বেশী দিন চলতে থাকে তাহলে অপারেশন করিয়ে নেয়া ছাড়া ভাল হবার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

সার্জিকেল চিকিৎসা বা অপারেশন ঃ

এ রোগের জন্য অপারেশন করতে হতে পারে এ কথা শুনলেই রোগীদের আত্মা শুকিয়ে যায়। রোগীরা বলেন, স্যার এমনিতেই এত ব্যথা টয়লেটে যেতে পারিনা তার ওপর অপারেশন করলে টয়লেট করব কি করে? আবার এই রোগীরাই যখন অপারেশনে রাজী হন তখন অপারেশনের পর বলেন স্যার, গত ১৫ বৎসর পর এই প্রথম আরাম করে পায়খানা করলাম। অনেকে বলেন, স্যার টয়লেটে এখন এত আরাম পাচ্ছি যে তখনই আপনার জন্য দোয়া করি। আসলে মলদ্বারের এই ফিসার বা ঘা না শুকানো পর্যন্ড় রোগীর সমস্যা চলতে থাকে। টয়লেটে গেলে মল বেরিয়ে আসতে চায় না। অনেক সময় নষ্ট করে এবং নানা কসরত করে রোগীকে মলত্যাগ করতে হয় এমনকি বায়ু বের করতেও কষ্ট হয়। ঔষধে না সারলে অপারেশনই এই ঘা শুকাবার একমাত্র পথ, এবং তারপরই সমস্ড় সমস্যার সমাধান হবে। অপারেশনের অব্যবহিত পরই রোগী আরামে মলত্যাগ করতে পারবেন কিন্তু অপারেশনের ঘা শুকাতে ২-৪ সপ্তাহ লাগতে পারে। তবে রোগীরা ৫-১০ দিনের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন। অপারেশনের জন্য হাসপাতালে মাত্র ২-৩ দিন থাকতে হয়।

সবচেয়ে দুঃখজনক যে প্রশ্নটি সর্বদা শুনতে হয় তা হল এই যে, রোগীরা বলেন যে স্যার শুনেছি এই রোগ অপারেশন করলেও বারে বারে হয় তাই আর অপারেশন করিয়েই বা লাভ কি? আমি জানিনা কোথা থেকে বেশীর ভাগ রোগী এমনকি বিদেশে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন এমন রোগীও একই ধারণা পোষণ করেন। একথা বলার সময় অনেক রোগী কোন কোন ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে উনি বলেছেন যে "আপনাকে সারা জীবন এসমস্যা নিয়েই চলতে হবে। যা ঔষধ দিয়েছি এগুলো এবং বেলের শরবত খাবেন। মল নরম রাখবেন। এভাবে যতদিন চলতে পারেন। অপারেশন করিয়ে লাভ নেই আবার এটি হতে পারে।"

এর উত্তরে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে এ রোগের অপারেশনের সাফল্য আন্তর্জাতিক ভাবে ৯৫-৯৯% এবং আবার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিগত ৯ বৎসরে আমি এ ধরনের শত শত অপারেশন করেছি এবং ৯৭% রোগী ভাল হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে।

অপারেশন পদ্ধতি ঃ

ক) মলদ্বারের মাংসপেশীর সম্প্রসারণ (Anal dilatation) –এ পদ্ধতিটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং সাফল্য খুবই সামান্য বলে বেশীর ভাগ সার্জন এর বিপক্ষে।

খ) মলদ্বারের অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার মাংশপেশী কেটে দেয়া (Lateral Internal Sphincterotomy) এই অপারেশনে মলদ্বারের অভ্যন্তরীণ স্ফিংটারে (Sphincter) একটি সূক্ষ অপারেশন করতে হয়। এটির কৌশলগত হেরফের হলে মল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। অজ্ঞান না করে অপারেশন করা যায়। ১-২ দিন পর রোগী বাড়ী ফিরে যেতে পারে। তবে কাজে যোগদান করতে ৫-১০ দিন লাগতে পারে। বিদেশে রোগ জটিল হওয়ার আগেই অপারেশন করা হয় ফলে তারা অল্প সময় পরে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে যাদের চিকিৎসা করি তারা শুধু এনাল ফিসার নিয়েই আসেন না এর যে জটিলতা আছে অর্থাৎ ফোঁড়া, ফিষ্টুলা, Hypertrophied anal papilla এসব নিয়ে আসেন ফলে এর অপারেশনে বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য কাটাছিড়া করার কারণে সুস্থ হতে অনেক বেশী সময় লাগে।

আমি অপারেশনের তিন ঘন্টা পর তরল খাবার এবং ছয় ঘন্টা পর স্বাভাবিক খাবার খেতে দেই। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে বেশীক্ষণ না খাইয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। অপারেশনের ১-২ দিন পর রোগী চলে যেতে পারে। এরপর ৭ দিন অন্তর একবার চেকআপের জন্য আসতে হয়। না আসলে কোন জটিলতা হলে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়।

ফিষ্টুলা নিয়ে কিছু কথা

কোন কোন সার্জনের ভুল ধারণা রয়েছে যে, জটিল ফিষ্টুলা অপারেশন করতে পেটে কৃত্রিম মলদ্বার (Colostomy) করতে হবে। আমি মনে করি কোন জটিল ফিষ্টুলার অপারেশনে Colostomy করার প্রয়োজন নেই। প্রসংগত উলে- খ্য যে, ইতিমধ্যে আমি কয়েকটি রোগীর অপারেশন করেছি যাদের ইতিমধ্যে ১-৩ বার অপারেশন হয়েছিল এবং এর মধ্যে দু'একবার (Colostomy) করেও অপারেশন করা হয়েছিল; কিন্তু অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে। এদেরকে আমি Colostomy না করেই অপারেশন করেছি এবং তারা ভাল হয়েছেন। তবে ব্যতিক্রমী কিছু ফিষ্টুলা আছে যার জন্য কলোষ্টমী করতে হয় যার সংখ্যা অত্যন্ড় কম। বিগত নয় বৎসরে এরূপ কয়েকটি ফিষ্টুলার জন্য আমি কলোষ্টমী করেছি।

জটিল ফিষ্টুলা অপারেশনে সিটন প্রযুক্তি ?

আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর আগে হিপোক্রেটিস এই প্রযুক্তির ধারণার জন্মদাতা। এ প্রযুক্তিতে মলদ্বারের মাংসপেশীকে অত্যন্ড় ধীরে ধীরে কাটার ব্যবস্থা করা হয়। ২-৩ সপ্তাহে কাটা সম্পন্ন হয়। রাবার ব্যান্ড অথবা পেনরোজ ড্রেইন টিউবের সাহায্যে মাংসপেশীকে বেঁধে দেয়া হয়।

এ প্রযুক্তির কারণে স্থানীয়ভাবে প্রদাহের সৃষ্টি হয় যার কারণে মাংসপেশী দুরে সরে যায় না। এটি কতদিন পরপর ব্যবহার করতে হবে এবং কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা বেশ বৈচিত্র্যময়। এটি নির্ভর করছে যে সার্জন অপারেশন করবেন তার উপর। ইতিমধ্যে আমি চট্টগ্রামের একজন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যন্ড় জটিল একটি ফিষ্টুলা অপারেশন করছি। এর আগে তিনি ১৯৯৪ সনে একজন অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা অপারেশন করান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সফল হননি। এরপর তিনি অপারেশনের জন্য আমেরিকা যাবার প্রস্তুতি নেন। পরে সিদ্ধান্ড় পাল্টিয়ে আমাকে দিয়ে অপারেশন করান। উনার তিনটি ফিষ্টুলার মধ্যে দুটি অত্যন্ড় জটিল ছিল। প্রথম দিন অপারেশনে আমি সিটন প্রয়োগ করি। ৭ দিন পর এটি অপসারণ করে অন্যটিতে সিটন প্রয়োগ করি এবং এর ১৪ দিন পর দ্বিতীয় সিটনটি অপসারণ করে পুনরায় প্রয়োগ করি যা ৭ দিন পর আবার অপসারণ করি। তিনি সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন।

অপারেশনের সাফল্য ?

অপারেশনের কথা শুনলে রোগীরা বলেন যে, স্যার শুনেছি অপারেশন করলে আবার হয় তাই অপারেশন করে আর লাভ কি ? কিন্তু আমি বলব, অপারেশনের সাফল্য চমৎকার। কিন্তু এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ফিষ্টলার প্রকার ভেদের কারণে এর সাফল্য তুলনা করা কষ্টসাধ্য। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সার্জনের বিভিন্ন অপারেশন কৌশল। কি কারণে ফিষ্টুলা হয়েছিল তার উপরও ফলাফল নির্ভর করে। সাফল্য এবং ব্যর্থতার মাপকাটি হচ্ছে তিনটি ঃ

(ক) পুনরায় ফিস্টুলা হওয়া; (খ) ক্ষত শুকাতে অতিরিক্ত দেরী হওয়া; (গ) মল ও বায়ু ধরে রাখার অক্ষমতা। অপারেশনের ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে যদি সার্জন ফিষ্টুলার ভিতরের মুখটি সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন এবং এটি সম্পূর্ণ কেটে ফেলতে না পারেন। আমি এটি সনাক্ত করার চেষ্টা করি যখন রোগী আমাকে চেম্বারে দেখায় তখনই। এবং অপারেশনের সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমি এটিকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করি। তবে জটিল ফিষ্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত ঃ ৭-১৫%।

কম জটিল ফিষ্টুলার অপারেশন

অপারেশনের পর ৪-৯% আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষত শুকাতে দেরী হয় ঃ ৭% ক্ষেত্রে। বায়ু এবং মল নিয়ন্ত্রণের সামান্য অক্ষমতা ৭-১২%।

পায়ুপথের আরেক সমস্যা ফিষ্টুলা বা ভগন্দর

ফিষ্টুলা বা ভগন্দর রোগটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি থেকেই ডাক্তারদের কাছে সুপরিচিত। ফিষ্টুলার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। নালীটি মলদ্বারের কোন কোন স্ড়র ভেদ করেছে বা কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে মূলতঃ তার উপর নির্ভর করছে এর জটিলতা। বিভিন্ন ধরনের ফিষ্টুলার চিকিৎসার জন্য রয়েছে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি। রোগীদের ধারণা আমাদের দেশে ফিষ্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। শতকরা হার আমি বলতে পারব না। যার কারণে রোগীরা অপারেশনের কথা শুনলেই বলেন যে, স্যার দেখুন বিনা অপারেশনে করতে পারবেন কিনা কারণ অপারেশন আর কত করবেন এটিত আবার হবেই। বেশ কিছু রোগী পেয়েছি যাদের ১-৩ বার এমনকি পাঁচবার পর্যন্ড় অপারেশন হয়েছে।
আন্র্জাতিকভাবে বিশেষজ্ঞদের মতে ৫-১০% আবার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফিষ্টুলা রোগটির কারণ কি এবং কি করে হয় ?

উত্তরঃ এ রোগটির উৎপত্তি হয় মলদ্বারের বিশেষ ধরনের সংক্রমণ- এর কারণে। মলদ্বারের ভিতরে অনেকগুলো গ্রন্থি রয়েছে এগুলোর সংক্রমণের কারণে ফোঁড়া হয়। এই ফোঁড়া এক সময় ফেটে গিয়ে মলদ্বারের চর্তুদিকের, কোন একস্থানে একটি ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসে এবং পুঁজ নির্গত হতে থাকে। এই সংক্রমনের কারণে মলদ্বারে প্রচুর ব্যথা হয়। রোগী সারাদিন ব্যাথায় কাতরাতে থাকে। পুঁজ বের হওয়ার পর ব্যথা কমতে থাকে। মলদ্বারে পার্শ্বস্থিত কোন স্থানে এক বা একাধিক মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে পুঁজ বের হয়ে আসাকে আমরা ফিষ্টুলা বা ভগন্দর বলে থাকি। সাধারণত লোকের ধারণা যে কৃমির বাসা থেকে এর উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এ ধারণাটি একেবারেই অমুলক বলে প্রমাণিত হয়েছে।
মলদ্বারের ক্যান্সার এবং বৃহদান্ত্রের প্রদাহজনিত রোগে ও ফিষ্টুলা হয়ে থাকে। মলদ্বারে যক্ষার কারনেও ফিষ্টুলা হতে পারে।

ফিষ্টুলা কত প্রকার ?

এটিকে সাধারণত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ
১। সাধারণ
২। মাঝারি জটিল
৩। অত্যন্ড় জটিল

সাধারণ ফিষ্টুলা ঃ এটি মলদ্বারর মাংশপেশীর খুব গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় চিকিৎসা সহজসাধ্য।

জটিল ফিষ্টুলা ঃ এর বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে এবং তা নির্ভর করে এর নালীটি মলদ্বারের মাংশের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে এবং কতটা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এটি বাহিরের মুখ পর্যন্ড় এসেছে। এগুলোর চিকিৎসা সত্যিকার দুঃসাধ্য। তারপর যদি এ নালী একের অধিক হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। এ রোগের

অপারেশনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল সঠিকভাবে অপারেশন সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে রোগী মল আটকে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

ফিষ্টুলা বা ভগন্দরের লক্ষণ বা উপসর্গ কি কি ?

এ রোগের লক্ষণ মূলতঃ তিনটি
১. ফুলে যাওয়া
২. ব্যথা হওয়া এবং
৩. নিঃসরন বা পূঁজ ও আঠাল পদার্থ বের হওয়া।

বেশির ভাগ রোগীই আগে মলদ্বারে ফোঁড়া হয়েছিল বলে জানান। ভিতরে ফোঁড়া হওয়ার জন্য ফুলে যায় এবং ব্যাথা হয়। যখন এগুলি ফেটে মুখ দিয়ে কিছুটা পুঁজ বের হয়ে যায় তখন ব্যথা এবং ফুলা কমে যায়। নিঃসরণ বা পুঁজ পড়া সাধারণত মাঝে মাঝে হয়। কখনও কখনও ২-৪ মাস রোগটি সুপ্ত থাকে। কখনও কখনও মলের সাথে পুঁজ ও আম পড়তে থাকে। সমস্যা একটানা না থাকার কারণে রোগীরা অনেক সময় ভাবেন যে বোধ হয় সেরে গিয়েছেন। এ কারণে বিভিন্ন ধরনের টোটকা ঔষুধ বা হোমিপ্যাথি খেয়ে মনে করেন যে সম্ভবতঃ ভাল হয়ে যাব। কিন্তু দু'চার মাস পর আবার যখন একই সমস্যা দেখা দেয় তখন আবার আমাদের কাছে এসে বলেন স্যার এখন কি করা যায় ?

কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন ঃ

১। প্রক্টস্কপি, সিগময়ডসকপি
২। কোলনস্কপি
৩। বেরিয়াম এক্সরে
৪। ফিষ্টুলো গ্রামঃ খুব একটা অবদান রাখতে পারে না। মলদ্বারের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করাটা আমার কাছে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ মনে হয়।
৫। এনাল এন্ডোসনোগ্রাফি

ফিষ্টুলার নালীটির পথ পরিক্রমা জানার উপায় কি ?

১. গুডসলস সূত্র;
২. মলদ্বারের পুংখানুপুংখ্ ফিজিক্যাল পরীক্ষা;
৩. এন্ডোস্কপি;
৪. নালীর ভিতর প্রোব বা শলাকা দিয়ে পরীক্ষা;
৫. নালীটি টেনে ধরে পরীক্ষা করা এবং
৬. ইনজেকশন পদ্ধতি ঃ
ক) রং দিয়ে পরীক্ষা যেমন মিথাইনলিন ব-ু;
খ) দুধ;
গ) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড।

চিকিৎসা কি ?

যদিও আমি বলেছি যে ৯০% পাইলস রোগীর কোন অপারেশন দরকার নেই, আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাথা ও অপারেশন ছাড়া এর চিকিৎসা করছি। কিন্তু এই রোগে ১০০% রোগীর অপারেশন দরকার। ফিষ্টুলা বা ভগন্দর থেকে যখন পুঁজ পড়ে বা ব্যথা করে তখন রোগী অপারেশন করতে রাজী হন। অভিজ্ঞ সার্জনগণ বলে থাকেন যে ফিষ্টুলা অপারেশনের সমস্যা নিয়ে সার্জনদের যত বদনাম হয়েছে অন্য কোন অপারেশনের বেলায় এতটা হয়নি। এজন্য আমি মনে করি যে এই অপারেশন করতে সার্জনের এই বিষয়ে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ ও বুৎপত্তি থাকা উচিত।

অপারেশনের পূর্বে বৃহদান্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ বা রেকটাম ক্যান্সার বা মলাশয়ের যক্ষা আছে কি না অব্যশই পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। এ অপারেশনে দু'ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

১। ভগন্দরের নালীটি কেটে ভিতরের পথটি খুলে দিতে হয়।
২। ভগন্দরের নালীটি আগাগোড়া কেটে উপড়ে ফেলে দিতে হয়।

এ দু'টি পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য হল প্রথমোক্তটির চেয়ে দ্বিতীয়টিতে ঘা শুকাতে অনেক বেশী সময় লাগে। অপারেশনের সময় সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয় এই নালীটির পথ পরিক্রমা চিহ্নিত করা। কারণ এই নালিটি মলদ্বারের মাংশপেশীর ভিতর বিভিন্ন আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ড় মলদ্বারের ভিতরে প্রবেশ করে। সমস্যা হচ্ছে এই যে এই নালীটি কাটতে গিয়ে আমরা যদি মলদ্বারের চতুর্দিকের মাংশপেশী বেশী করে কেটে ফেলি তাহলে রোগী মলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তাই জটিল ফিষ্টুলা অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে নালীটি মাংশপেশীর অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে তা অপারেশন করতে হলে আমাদের ভিন্নতর প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং তখন অপারেশনটি আর একবারে করা সম্ভব নয় বরং কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে করতে হয়। এ প্রযুক্তিটির নাম হচ্ছে সিটন প্রযুক্তি। দু'টি পর্যায়ের মাঝখানে ১-২ সপ্তাহ বিরতি দিয়ে এ অপারেশন দু'থেকে তিনটি পর্যায়ে করতে হতে পারে। তাতে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।
এ অপারেশনে মলদ্বারের অনেক মাংশপিন্ড কেটে বাদ দিতে হয় যাতে গর্তটি এর তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ভরে উঠতে পারে। ফিষ্টুলাটি কাটার পর -এর একটি অংশ বায়োপসি পরীক্ষার জন্য পাঠানো উচিত। মহিলাদের ফিষ্টুলা অপারেশনের বিশেষ সর্তকতা প্রয়োজন এবং মাংশপেশী কাটার পর সাথে সাথে তা জোড়া দিয়ে দেয়া উচিত। অথবা সিটন প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া উচিত।

অপারেশনের পরবর্তী পরিচর্যা ঃ

অপারেশনের পর মলদ্বারের ভিতর কোন পাইপ দেয়ার প্রয়োজন নেই। ৬ ঘন্টার পর স্বাভাবিক খাবার দেয়া যায়। ক্ষতস্থানটি ড্রেসিং করে সবসময় পরিস্কার করে রাখতে হবে। সাতদিন পর পর ডাক্তারের চেম্বারে আসা উচিত। যত দিন পর্যন্ড় ঘা না শুকায় ততদিন প্রতিদিন ২-৩ বার sitz bath বা Hip bath দেয়া উচিত। গরম পানিতে লবণ দিয়ে কোমর ডুবিয়ে মলদ্বারে সেক দিতে হয়।
Simple বা সাধারণ ফিষ্টুলার ক্ষেত্রে দু একদিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া যায়। জটিল ফিষ্টুলার ক্ষেত্রে বেশি সময় হাসপাতালে থাকতে হয়। ক্ষত শুকাতে সাধারণত ৪-১০ সপ্তাহ পর্যন্ড় লাগে। জটিল ফিষ্টুলার আবার শ্রেণীভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন জটিল ফিষ্টুলা আবার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিও প্রযুক্তি প্রয়োগে অপারেশন করতে হয়।

অপারেশনের পর আবার ফিস্টুলা হওয়াই কি নিয়ম?

ফিষ্টুলা (ভগন্দর বা নালী ঘা) মলদ্বারের একটি বিশেষ রোগ। এ রোগ পায়ুপথের ভিতরে গ্রন্থির সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সংক্রমণের কারণে মলদ্বারের পার্শ্বে ফোড়া হয়। বেশ কয়েকদিন ব্যথা থাকে এবং ফুলে যায়। এরপর এটি ফেটে গিয়ে মলদ্বারের পাশের কোন একটি জায়গা দিয়ে পুঁজ বেরিয়ে যায়। অতপর ব্যথা এবং ফুলা কমে যায়। রোগী বেশ কিছুদিন আরাম বোধ করেন। কিছুদিন ভাল থাকার পর হঠাৎ আবার মলদ্বার ফুলে যায় এবং ব্যথা হয়। দু'চারদিন পর পুরনো সেই মুখ দিয়ে আবার কিছু পুঁজ বের হয় এবং রোগী আরামবোধ করেন। চিকিৎসা না করা হলে এই প্রক্রিয়া বৎসরের পর বৎসর চলতে থাকে। পুঁজ পড়ার বিষয়টির তারতম্য ঘটে। সামান্য পুঁজ হলে রোগীরা এটিকে পুঁজ হিসাবে গণ্য করেন না। তখন তারা বলেন যে একটু আঠাল রস বের হয় বা মলদ্বারে একটু ভিজে যায় ইত্যাদি। পুঁজের সাথে সাধারণতঃ রক্ত যায় না। কিন্তু কখনো কখনো অল্প রক্ত যেতে পারে। মলদ্বারের চতুর্দিকে এক বা একাধিক মুখ দেখা দিতে পারে। তিন থেকে ছয়টি মুখ পর্যন্ড় দেখেছি। রোগীরা প্রশ্ন করেন যে, এটি বিনা চিকিৎসায় বেশীদিন থাকলে ক্যান্সারে আক্রান্ড় হতে পারে কিনা? ফিষ্টুলা দীর্ঘদিন থাকলেও ক্যান্সারে আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে খুব কম ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে। আর একটি বিষয় হচ্ছে পায়ুপথে ক্যান্সার বেশীদিন বিনা চিকিৎসায় থাকলে ফিষ্টুলা দেখা দিতে পারে। এরূপ পায়ুপথের ক্যান্সারের ফলে উদ্ভুত ফিষ্টুলার বেশ কয়েকজন রোগী দেখেছি।

ফিষ্টুলা বা ভগন্দর রোগের চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। অনেক রোগী আছেন ১০-২০ বৎসর এ রোগে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছেন কিন্তু অপারেশন করছেন না, কারণ হিসাবে বলেছেন যে, অপারেশন করলে নাকি আবার হয় তাই অপারেশন করে আর লাভ কি? আবার অনেকে অপারেশনকে ভয় পান। ভয় পেয়ে কেউ কেউ তথাকথিত বিনা অপারেশনে চিকিৎসার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যান। কোন কোন হাতুড়ে ডাক্তার ইনজেকশনের সাহায্যে ভাল করার নামে বিষাক্ত কেমিক্যাল ইনকেজশন দেন। এই ইনকেজশনে রোগী ভীষণ ব্যথা অনুভব করেন এবং মলদ্বারের মাংসের পচন ধরে গায়ে জ্বর আসে। এরপর ঐ হাতুড়ে ডাক্তারকে যদি বলা হয় যে, এত কষ্ট এবং এই পচন ধরবে একথা ত আগে বলেননি। তখন তিনি উত্তর দেন যে, এগুলো বললে আপনি ইনজেকশন নিতেন না। এ প্রক্রিয়ার ফলে মলদ্বারে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে যেমন মল আটকে রাখতে না পারা, মলদ্বার নীচে ঝুলে পড়া, মলদ্বার অতি সর" হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব ভুক্তভোগী রোগীরা লোকলজ্জা এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবার কারণে এসব কথা ডাক্তার ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

পাইলসের চিকিৎসায় যে ইনকেজশন দেয়া হয় তাতে কারো টের পাবার কথা নয়। ব্যথা পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর সপ্তাহে একটি করে মোট সাতটি ইনজেকশন দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পাইলস ছাড়া অন্যান্য রোগে ইনজেকশন দেয়ার জন্য বিধান নেই। তাই আপনার আগে জেনে নেওয়া উচিত যে আপনার রোগটি আসলেই পাইলস কিনা। এবার আসা যাক ফিষ্টুলা অপারেশন করলে আবার হয় কিনা এই প্রশ্নে। এক কথায় এর উত্তর দেয়া কঠিন। যেহেতু ফিষ্টুলার প্রকারভেদ রয়েছে এবং বিভিন্ন সার্জন ভিন্ন ভিন্ন অপারেশন কৌশল অবলম্বন করেন তাই এর সাফল্য তুলনা করা দুস্কর। এছাড়া কি

কারণে ফিষ্টুলা হয়েছিল তার উপরও ফলাফল নির্ভর করে। তবে বিস্ড়রিত আলোচনায় না গিয়ে খুব সংক্ষেপে বলতে হলে আমি বিগত নয় বৎসরের এ জাতীয় বহু অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে বলব যে, জটিলই হোক বা বারে বারে হওয়া ফিষ্টুলাই হোক অপারেশনের পর আবার হওয়ার ধারণাটি অতিরঞ্জিত এবং কালেভদ্রে ঘটে। অপারেশনের পর আবার হওয়ার কারণগুলো পর্যালোচনা করা দরকার ঃ

১। ফিষ্টুলার প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন সাধারণ ফিষ্টুলা ও জটিল ফিষ্টুলা। সাধারণ ফিষ্টুলা অপারেশন সহজসাধ্য। কিন্তু জটিল ফিষ্টুলা যেহেতু মলদ্বারের গভীরে মাংসপেশীর ভিতর প্রবেশ করে তাই এর চিকিৎসাও জটিল। এ ধরনের ফিষ্টুলা অপারেশন করতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি থাকলে ভাল হয়। যেহেতু মলদ্বারের গভীরে প্রবেশ করে এবং এক ধাপে এই অপারেশন করলে রোগীর পায়খানা আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে তাই কয়েক ধাপে সিটন প্রয়োগের মাধ্যমে করলে অধিকতর সফলতা পাওয়া যায়।

২। ফিষ্টুলার নালীটি বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করতে পারে। সেগুলো ধৈর্য্য সহকারে খুঁজে দেখতে হবে।

৩। ফিষ্টুলার ভিতরের মুখটি কোথায় তা সনাক্ত করতে হবে। অনেক সময় ভিতরের মুখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪। জটিল ফিষ্টুলা অপারেশনে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে ধৈয সহকারে সার্জনের কর্মসম্পাদন করা উচিত। যিনি প্রথম অপারেশন করেন তার হাতেই ভাল হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগটি থাকে। বারবার অপারেশনে সাফল্যের সুযোগ কমতে থাকে।

৫। অভিজ্ঞ সার্জনগণের মতে, 'ফিষ্টুলা আপারেশনের পর সার্জনদের যত বদনাম হয়েছে অন্য কোন অপারেশনে এতটা হয়নি।

৬। এ অপারেশনের পর মাংস পরীক্ষা করা (Biopsy) করা উচিত কারণ যদি এটি যক্ষ্মার কারণে হয়ে থাকে তাহলে যক্ষ্মার ঔষধ না খাওয়ানো পর্যন্ড় এটি বারে বারে হতে থাকবে। আবার যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তাহলে বড় ধরনের অপারেশন করতে হবে।

৭। পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন ক্রন'স ডিজিজ যদি সন্দেহ করা হয় তাহলে মলদ্বারের ভিতর কোলনস্কপি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। এতে যদি এই রোগ ধরা পড়ে তাহলে বিশেষ সতর্কতার সাথে ফিষ্টুলা অপারেশন করতে হবে।

৮। পায়ুপথে ক্যন্সারের কারণে ফিষ্টুলা হলে ক্যান্সারের অপারেশন করতে হবে।

৯। সাফল্য ও বর্থ্যতার মাপাকাঠি হচ্ছে তিনটি ঃ

ক) পুনরায় ফিস্টুলা হওয়া
খ) ক্ষত শুকাতে অতিরিক্ত দেরী হওয়া
গ) মল ও বায়ু ধরে রাখার অক্ষমতা

বিভিন্ন গবেষণা পত্রে দেখা যায় জটিল ফিষ্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত ৭-১৫% এবং সাধারণ ফিষ্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা ৪-৯%। ক্ষত শুকাতে দেরী হয় ৭% ক্ষেত্রে। বায়ু ও মল নিয়ন্ত্রণের সামান্য অক্ষমতা ৭-১২%।

একজন ফিস্টুলা রোগীর কেসহিষ্ট্রি

বয়সে তর"ন, ৩৫ বছর। পেশায় চিকিৎসক। উত্তর বঙ্গের একটি হাসপাতালের হাড় ও জোড়া বিশেষজ্ঞ কনসালট্যান্ট। হঠাৎ করে মলদ্বারে ব্যাথায় আক্রান্ড় হন। ধরা পড়ে মলদ্বারে ফোঁড়া হয়েছে। অপারেশন করালেন ঢাকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে। কয়েকমাস পর আবার ফুলে উঠে ব্যাথা হয় পূঁজ পড়ে। এবার ও অপারেশন করা হলো। কিছুদিন ভাল থাকলেন আবার যথারীতি ব্যাথা ও পূঁজ যাওয়া। এবার অন্য একজন সার্জনকে দেখালেন এবং অপারেশন হলো। কয়েকমাস পরে আবার সেই একই সমস্যা। এবার আরও সিনিয়র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করলেন এবং অপারেশন করা হলো। কিন্তু কয়েকমাস পর আবার ও একই অবস্থা। এ অবস্থায় বারবার সমস্যা দেখা দেওয়ায় আরও তিনবার অপারেশন করা হলো কিন্তু সমস্যা যাচ্ছে না। মোট সাতবার অপারেশন করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। মলদ্বারের পাশের মুখ দিয়ে ফুলে উঠে ব্যাথা হয় এবং পূঁজ যায়। রোগী (যিনি নিজেই ডাক্তার) হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। একজন বিশেষজ্ঞ সার্জনের পরামর্শে রোগী লেখককে দেখান। লেখক তাকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অপারেশনের কথা বললেন। যেহেতু এটি জটিল ধরনের ফিষ্টুলা (ভগন্দর) তাই রোগীকে তিন ধাপে সিটন পদ্ধতিতে অপারেশন করতে হবে বলে উপদেশ দিলেন। তিনধাপে ঐ রোগীকে সিটন প্রয়োগ করে অপারেশন করা হলো। নিয়মিত ড্রেসিং করা হলো। ডাক্তার রোগীর স্ত্রীও একজন এমবিবিএস ডাক্তার। তাই ড্রেসিং এ তিনি প্রচুর সাহায্য করলেন। আল-াহর রহমতে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন।

ফিষ্টুলা রোগ অপারেশন করলে আবার হতে পারে এটিই প্রচলিত ধারনা এমনকি চিকিৎসকদের মাঝেও। সার্জারী বইয়ের ভাষায় "ফিষ্টুলা রোগটি নিয়ে চিকিৎসকরা বিগত ২০০০ বৎসর যাবৎ বড়ই বিপাকে আছেন। ফিষ্টুলা অপারেশনের পর চিকিৎসকদের যত বদনাম হয়েছে অন্য কোন অপারেশনে ততটা হয়নি"। মলদ্বারের রোগের এই জটিলতার কারনে ১৮৩৫ সালে লন্ডনে একটি আলাদা হাসপাতাল হয় যার নাম সেন্ট মার্কস হাসপাতাল ফর দ্য ডিজিজেস অব কোলন এ" রেকটাম। অর্থাৎ বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারীর জন্য আলাদা হাসাপাতাল। আজ থেকে ১৭০ বৎসর আগে চিকিৎসকরা এজাতীয় রোগের বিশেষত্ব বুঝে আলাদা হাসপাতাল করেছেন যা এখন ল"নে রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ড় উন্নত দেশে বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী আলাদা বিশেষজ্ঞ বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত।

লেখক বিগত নয় বৎসরে এজাতীয় বারে বারে হওয়া ফিষ্টুলা রোগীদের সফল ভাবে অপারেশন করে আসছেন। অপারেশনের পরে আবার হওয়ার সম্ভাবনা অতি নগন্য। লেখক বিগত নয় বৎসর মলদ্বারের সমস্যায় আক্রান্ড় ২৯,৬৩৫ জন রোগীর উপর গবেষণা করে দেখেছেন এদের ৩৫% এনাল ফিলার, ১৮% পাইলস, ১৫% ফিষ্টুলা ও ২.৬৫% ক্যান্সারে আক্রান্ড়। এই গবেষণায় দেখা যায় ফিষ্টুলা রোগীদের ৮৪% সাধারণ ফিষ্টুলা এবং ১৬% জটিল ফিষ্টুলা। লেখকের দেখা ফিষ্টুলা রোগীদের ১৭% বারে বারে অপারেশনে ব্যার্থ হওয়া রোগী যার মধ্যে বিদেশে একাধিকবার অপারেশন করে ব্যর্থ হওয়া রোগী ও আছেন। অল্প সংখ্যক রোগী পাওয়া গেছে যাদের ক্যান্সারের কারনে ফিষ্টুলা হয়েছে।

রেকটাম ও মলদ্বার মানবদেহের একটি জটিল অংগ। এবিষয়ে বিশেষভাবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সার্জন অপারেশন করলে ফিষ্টুলা রোগটি বারে বারে হওয়ার সম্ভাবনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। লেখক এবিষয়ে তার গবেষণা প্রবন্ধের জন্য জুন ২০০০-এ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল স্কলার সম্মাননা লাভ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন প্রবন্ধে। গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, "অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও বারংবার ফিষ্টুলা হওয়া কি রোগটির ধর্ম নাকি পূর্ববর্তী অস্ত্রোপচারের ত্রুটি"।

রেকটাল প্রোল্যাপ্সঃ মলদ্বার বেরিয়ে আসা বা আলিশ রোগ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি থেকেই এ রোগটি চিকিৎসকদের কাছে পরিচিত। এ রোগে রোগীর পায়ুপথ মলদ্বারের বাইরে বেরিয়ে আসে। বিশেষত পায়খানা করার সময় বাইরে ঝুলে পড়ে। এরপর রোগী হাত দিয়ে এটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। দেশের বিভিন্ন এলাকার রোগীরা এটিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন সিলেটে বলে আলিশ, হবিগঞ্জ এলাকায় বলে কম্বল বের হয়েছে এবং বরিশালের লোকেরা বলে আইলতা বের হয়েছে।

কেন হয় ?

এ রোগটি শিশু ও বৃদ্ধ বয়সে বেশী হয়। মহিলাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বাচ্চাদের সাধারণত তীব্র ডায়রিয়ার পর এ রোগটি দেখা দেয়। তল পেটের বা পেলভিসের কিছু গঠনগত সমস্যা এ রোগের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পায়ুপথ বা রেকটাম অন্যান্য মাংসপেশীর সাথে আকড়ে থাকে। কিন্তু এ রোগীদের ক্ষেত্রে এটির অভাব দেখা যায়। এ রোগে বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে মলত্যাগের অভ্যাসের অসংগতি যেমনঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, মহিলাদের বন্ধাত্ব; রেকটামের সাথে সন্নিহিত অস্থির দৃঢ় সংযুক্তির অভাব ইত্যাদি। মানসিক রোগীদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। জগদ্বিখ্যাত পায়ুপথ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গলিঘার-এর মতে তার দেখা রোগীদের এক তৃতীয়াংশই মানসিক রোগী।

উপসর্গ ঃ

রোগীরা সাধারণত অভিযোগ করেন যে, তাদের মলদ্বার পায়খানা করার সময় অনেকখানি নীচে ঝুলে পড়ে এবং চাপ না দিলে ভিতরে যায় না। ওজন তুললে অথবা কাশি দিলেও কখনও কখনও বেরিয়ে আসে। সাধারণত রক্ত যায় না, তবে মিউকাস বা আম যায়। যখন পায়ুপথ বেশী ঝুলে পড়ে এবং ঢুকানো যায় না তখন রক্ত যেতে পারে। প্রায় অর্ধেক রোগী কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন।

অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগীরা পায়খানা আটকে রাখতে ব্যর্থ হন। কখনও কখনও ঝুলে পড়া অংশটি চেষ্টা করেও ভিতরে ঢুকানো যায় না, অবস্থা আরও খারাপ হলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচন ধরতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর সাথে জরায়ু ও বেরিয়ে আসতে পারে এবং মুত্রথলিও ঝুলে পড়তে পারে যার কারণে প্রসাবের অসুবিধা হতে পারে।

এ রোগের শুরুতে রোগীরা বলেন যে, তাদের মনে হয় পায়ুপথ ভরা ভরা লাগে এবং ভিতরে কোন চাকা বা মাংসের দলা রয়েছে বলে মনে হয়। অনেকক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যা আরও বেশী মনে হয়। মলত্যাগ করতে বা বায়ু ত্যাগ করতে কিছুটা বাধা লাগে। পায়খানা করে পেট ক্লিয়ার হয়নি বলে মনে হয় এবং

আঙ্গুল দিয়ে পায়খানা করতে হয়। কারো কারো মলদ্বারের চতুর্দিকে ব্যাথা হয় যা নিতম্ব অথবা পায়ের দিকে বিস্তৃত হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

প্রোলাপস দু'ধরনের হতে পারে। আংশিক (Partial) যেক্ষেত্রে মিউকাস ঝিলী ঝুলে পড়ে এবং সম্পূর্ণ (Procidentia) সে ক্ষেত্রে পায়ুপথের প্রাচীরের সমস্ড় স্ড়রসহ ঝুলে পড়ে।
প্রলাপস যে প্রকারেরই হোক এর চিকিৎসা অপারেশন। তবে কোন রোগী যদি চিকিৎসার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হন বা অপারেশন করতে রাজী না হন তাহলে কিছু রক্ষণশীল পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যেমন - মলত্যাগের সময় মলদ্বার হাত দিয়ে চেপে উপরের দিকে রাখতে হয়, নিতম্ব দুটিকে টেপ দিয়ে আটকে রাখা, মলদ্বারের মাংসপেশীর ব্যায়াম, রিং লাইগেশন পদ্ধতি ইত্যাদি।

অপারেশন পদ্ধতি ঃ

এ রোগের চিকিৎসায় ৫০ ধরনের অপারেশন পদ্ধতি চালু রয়েছে। কোন কোনটি মলদ্বারে করতে হয় আবার কোন কোনটি পেট কেটে করতে হয়। এ রোগটি নিয়ে সমাজে ভ্রান্ড় ধারণা ও বিভিন্ন কুসংস্কার রয়েছে। নরসিংদী থেকে আগত ১২ বৎসরের একটি ছেলের এ রোগ ছিল। তার মলদ্বারে ছোট একটি অপারেশন করলে সে ভাল হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পর তার মা (৩৩ বৎসর) আমার কাছে আসেন এবং বলেন তারও একই রোগ রয়েছে বিগত ১২ বৎসর যাবৎ। মলত্যাগের পর পায়ুপথ বেরিয়ে আসত। এরপর চাপ দিলে ভিতরে ঢুকে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করলাম এতদিন কেন চিকিৎসা করাননি ? উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি এটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেছেন। এবং ভেবেছেন এর কোন চিকিৎসা নেই। তার ছেলের একই রোগের যখন চিকিৎসা হল এবং সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল তখন মা ভাবলেন যে এর সঠিক চিকিৎসা আছে। পরবর্তীতে আরো আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞেস করলাম সাথে আগত ভদ্রলোকটি কে ? তিনি বললেন তার ভাই। স্বামী কেন আসেনি জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন যে, উনি এ ব্যাপারটি জানেন না। আমি বললাম আপনার ১২ বৎসর যাবৎ এই সমস্যা- কেন তাকে জানাননি। তিনি বললেন যে, স্বামীকে জানালে তিনি খারাপ ভাববেন। তাই কখনই জানাতে চাই না। এর পর তার মলদ্বারে অপারেশন করায় তিনি ভাল রয়েছেন। প্রসংগত উলেখ্য যে, এই মহিলা মাঝে মাঝেই দিনে ৮-১০ বার পায়খানা করতেন। এ রোগটিক বলে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রম বা অতিরিক্ত সংবেদনশীল আন্ত্রিক জটিলতা। একই সাথে পেটের এই দীর্ঘস্থায়ী আমাশয়ের চিকিৎসায়ও তিনি উপকৃত হয়েছেন।

মতামত ঃ বিগত নয় বৎসরে ২৯,৬৩৫ জন রোগীর উপর গবেষনা করে দেখেছি যার শতকরা ১ ভাগ রোগী রেকটাল প্রলাপস রোগে ভুগছেন। এ সমস্ড় রোগীদের কেউ কেউ ১০-৩০ বৎসর যাবৎ এ সমস্যায় ভুগছেন এক্ষেত্রে পায়খানা করার সময় মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে আসে। মলত্যাগের পর রোগী চাপদিয়ে এটি ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। এতে সাধারণত রক্তযায় না। মিউকাস বা আমজাতীয় নিঃসরন হয় মলদ্বারের আশে পাশে। মলদ্বার ভিজা ভিজা থাকতে পারে, কখনো কখনো বের হওয়া মলদ্বারে ভিতরে ঢুকানো যায় না তখন বেশ ব্যথা হয় এবং জর"রী ভিত্তিতে অপারেশন করতে হয়। এ রোগে এ পর্যন্ড় যাদের অপারেশন করেছি তাদের ২জন ভাল হননি এবং একজন বয়স্ক রোগী মারা গেছেন। এ রোগীটির মলদ্বার বাইরে বের হলে আর ঢুকানো যায়নি যার কারণে সেখানে গ্যাংগ্রীন বা পচন ধরে যায়, তার পচন ধরা মলদ্বার কেটে ফেলার পরও তার অবস্থার উন্নতি হয়নি। এ রোগীটি প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ এ রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তীব্র সমস্যা না দেখায় তিনি অবহেলা করেছেন। অবস্থা যখন তীব্র আকার ধারণ করে মলদ্বার ভিতরে ঢুকাতে পারেননি এবং মলদ্বারর পচন ধরে যায় তখন তিনি চিকিৎসার জন্য আসেন। ইতিমধ্যে আমরা এ রোগের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে

Delorme's operation করেছি। এটি মলদ্বার দিয়ে করা হয়। পেট কাটা লাগেনা। এই বিশেষ ধরনের অপারেশনের ফলে ৮০% রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন।

মলদ্বারে চুলকানি ও তার প্রতিকার

প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসকরা মলদ্বারের চুলকানিকে একটি বিশেষ রোগ হিসাবে গণ্য করে আসছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ড় প্রাচীন পুস্ড়কেও এ সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। মলদ্বারে স্নায়ুতন্ত্রের প্রাচুর্যের কারণে সম্ভবত এটি বিভিন্ন ধরনের উত্তেজকের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগেও রহস্যময় এই রোগটির কারণ অনুসন্ধান ও চিকিৎসার কোনো সংক্ষিপ্ত ও সহজ-সরল সমাধান আমরা দিতে পারিনি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর চিকিৎসা করা সম্ভব, তবে তা নির্ভর করে রোগীর সঠিক ইতিহাস নেয়া, বিশেষ করে খাবারের এবং বিশেষ ধরনের আধুনিক ও অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর।

এ রোগে চুলকানি সাধারণত মলদ্বারে হয়ে থাকে। কখনও কখনও যৌনাঙ্গে চুলকানি দেখা যায়। কিন্তু ব্যাপারটি কখনও সারা শরীরে হয় না। এটি বেশি অনুভূত হয় রাতে। এমনকি চুলকাতে চুলকাতে রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এর ফলে নখের আঁচড়ে সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

কি কি রোগে এমন হয়

যদিও এটি বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ রোগে হতে পারে তবুও অনেক ক্ষেত্রেই মলদ্বারের কোনও রোগ পাওয়া যায় না। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এসব ক্ষেত্রেও চুলকানির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে মলদ্বার ও মলাশয়ের সমন্বয়ের ভারসাম্যহীনতা দায়ী বলে মনে করা হয়। এই রোগে মলদ্বারের ত্বকে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাইলস, ফিসার, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ায় মলদ্বারে চুলকানি হতে পারে। মলদ্বারের সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য রোগে মলদ্বারের চুলকানি হতে পারে। যেমন ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, ছত্রাক সংক্রমণ, কৃমি ইত্যাদি। সরিয়াসিস নামক ত্বকের রোগে এবং মলদ্বারের চর্ম স্নায়ুপ্রদাহ নামক বিশেষ ধরনের রোগে মারাত্মক রকমের চুলকানি হতে পারে। এই সাংঘাতিক চুলকানির কারণে মলদ্বারের চামড়া ছিঁড়ে যেতে পারে।

বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এ রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ জাতীয় রোগীদের মলাশয় ও মলদ্বারের মাংসপেশীর মধ্যে ফাংশনাল সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। আমার প্রশিক্ষণকালীন সিংগাপুর জেনারেল হাসপাতালের কলোরেকটাল সার্জারি বিভাগের বিশেষ ধরনের ল্যাবরেটরিতে রোগীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে উপরোক্ত তথ্যের যথার্থতা পাওয়া গেছে। এছাড়া মলদ্বারের ভিতরে কোলনস্কপি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ত্বকের হিসটোপ্যাথলজি ও ছত্রাক (ফাংগাস) পরীক্ষা করা যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ

ঐতিহ্যগতভাবে চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, এ রোগের চিকিৎসায় সফলতা পাওয়া দুষ্কর। তবে সঠিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে এবং ধৈর্য্য সহকারে চিকিৎসা চালিয়ে গেলে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষে এ রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের পথ্য, পেটেন্ট ঔষধ ও লোশন ব্যবহারে কমবেশি উপকার পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশনও ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো সার্জন মলদ্বারের ত্বক কেটে ফেলে নতুন ত্বক লাগিয়েও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কলোরেকটাল সার্জন ডাঃ ইউসোবিও মিথাইলিন ব-ু ইনজেকশন দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেয়েছেন।

এই রোগের চিকিৎসার সাম্প্রতিক ধারা অতি সম্প্রতি এ রোগে বিশেষ বিশেষ খাবারের ভূমিকা রয়েছে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। তাই রোগীর খাবার তালিকা সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস নেয়া অত্যন্ড় জর"রী। এভাবে দুর্ভোগ সৃষ্টিকারী খাদ্যের আইটেমটি চিহ্নিত করতে পারলে চিকিৎসা করা সহজ হয়। যে সমস্ড় খাবারের কারণে এ রোগ হতে পারে সেগুলো হচ্ছে - চা, কফি, মদ, বিয়ার, টমেটো, পনির ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধূমপান এ রোগের কারণ হতে পারে। এ খাবারগুলো কিভাবে এ রোগ সৃষ্টি করে তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এ খাবারগুলো বিশেষ বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মিউকাস নিঃসরণ ঘটায় এবং মলে অম্- ত্বের পরিবর্তন ঘটায়, যার কারণে চুলকানি হয়।

যেহেতু এই খাবারগুলো খুবই পরিচিত এবং বেশির ভাগ রোগীই এর কোনো কোনোটি খেয়ে থাকেন। তাই সার্জন যখন সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করেন তখন হ্যাঁ বোধক উত্তর পাওয়াই স্বাভাবিক। ঠিক কোন খাবারটি একজন রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ তা নিরূপণ করতে রোগীর সহযোগিতা দরকার এবং সার্জনের এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। একজন অভিজ্ঞ সার্জনের পক্ষে ক্ষতিকর খাবারটি চিহ্নিতকরণ করা সময় সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।

বিভিন্ন ঔষধ ও পথ্যের সাহায্যে কোষ্ঠ ব্যাবস্থাপনা এমন করতে হবে যাতে রোগী স্বাভাবিকভাবে মলত্যাগ করতে পারে। যে সব রোগী মল আটকে রাখতে পারে না অথবা মাঝে মধ্যে মল চুইয়ে পড়ে তাদের জন্য বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, রোগীর মলদ্বারে মল চুইয়ে পড়ছে কিন্তু তিনি ব্যাপারটি খেয়াল করছেন না। এ রোগে মলদ্বারের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা খুবই জর"রী। সাবান, স্যাভলন ব্যবহার প্রয়োজন নেই। মলদ্বার জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তা প্রয়োজনও নেই। যাদের টয়লেট পেপারে এলার্জি আছে তারা সেটি বর্জন করবেন। মলদ্বারের ভিতর বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়াশ দেয়ায় উপকার পাওয়া যায়। যাদের মলদ্বারে বেশি নিঃসরণ হয় তাদের যথাযথ ড্রেসিং পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া প্রয়োজন।
বিভিন্ন ধরনের মলম এবং ক্রিম এজন্য পাওয়া যায়। ঠিক কোন ক্রিমটি একজন রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা উচিত। এর অতিরিক্ত ব্যবহারে অ্যালার্জি জনিত চর্ম প্রদাহ হতে পারে। অভিজ্ঞ সার্জনের তত্ত্বাবধান ছাড়া স্টেরয়েড মলম ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেক রোগী পরিচিত জনকে যে মলমটি ব্যবহার করতে দেখেছেন সেটিকেই কারণে-অকারণে নির্দিধায় ব্যবহার করে থাকেন। ব্যাপারটি অবশ্যই ক্ষতিকর। স্টেরয়েড মলমের অতিরিক্ত ব্যবহার বিপজ্জনক।

এ রোগ অসহনীয় মাত্রায় হলে ঘুমের ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া বায়োফিডব্যাক পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি যার সাহায্যে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি দ্বারা মলদ্বারের ব্যয়াম করানো হয়। তবে বেশির ভাগ রোগীই যথাযথ চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠে।

অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিঃ
মলদ্বার না কেটে রেকটাম ক্যান্সার অপারেশন

রেকটাম বা মলাশয় ক্যান্সার হলে প্রচলিত অপারেশন হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় ও মলদ্বার কেটে ফেলে পেটে Colostomy বা কৃত্রিম মলদ্বার বানিয়ে সেখানে ব্যাগ লাগিয়ে দেয়া যার মধ্যে সব সময় মল জমা হবে এবং রোগী মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করে নেবেন। তার স্বাভাবিক মলদ্বার থাকবে না এবং সারা জীবন ঐ পথে আর পায়খানা হবে না কিন্তু অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে এখন স্বাভাবিক মলদ্বার রেখেই ক্যান্সারটি অপসারণ করা যায়। রোগী স্বাভাবিক পথেই পায়খানা করতে পারবেন। এ প্রযুক্তির ফলে ৭০-৮০% রেকটাম ক্যান্সার রোগী উপকৃত হবেন।

লক্ষণ কি?

মলদ্বারের দৈর্ঘ্য ৪ সে.মি। মলদ্বারের ওপরের ১২ সে.মি. অংশের নাম রেকটাম। মলদ্বারে রক্ত যাওয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ লক্ষণটিকে রোগীরা আমল দেন না। রোগী যদি এই রক্ত যাওয়ার কারণ ডাক্তার দিয়ে পুরোপুরি তদন্ড় না করেই সিদ্ধান্ড় নেন যে এটি পাইলস থেকে হচ্ছে-সবচেয়ে বিপদটি তখনই ঘটে। এরপর মাসের পর মাস কেটে যায় পাইলস মনে করে। ইত্যবসরে ক্যান্সার তার ডালপালা বিস্ড়ার করতে থাকে। পেটে ব্যথা হতে থাকে, মল আটকে গিয়ে পেট ফুলে উঠতে পারে। তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে বিশেষ ধরনের পরীক্ষায় এ রোগ ধরা পড়ে। ততক্ষণে এ রোগটি সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলার সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

প্রথম দিকে রোগীর মলত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন আসে। মলত্যাগের বেগ হলে রোগী টয়লেটে যান এবং শুধু রক্ত ও মিউকাস যেতে দেখেন। এটি সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে হয়। রোগীরা এটিকে রক্ত আমাশয় বলে ধারণা করেন। ক্যান্সার যখন মলদ্বারের দিকে সম্প্রসারিত হয় তখন মলত্যাগের পর ব্যথা শুর“ হয়ে দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে। রোগীদের যখন বলা হয় আপনাকে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, কোন ক্যান্সার আছে কি না। তখন তারা বলেন যে, স্যার আমি জানি এটি পাইলস। অনেক বছর যাবত চলছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে এখানে ক্যান্সার শুর“ হতে পারে তা তারা খতিয়ে দেখতে চান না। সবচেয়ে অসুবিধা হলো পাইলস, ক্যান্সার, এনাল ফিশার সব রোগেই রক্ত যাওয়াই প্রধান লক্ষণ। আসলে কোন রোগটি হয়েছে তা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে একজন অভিজ্ঞ সার্জনই কেবল বলতে পারেন। এই ক্যান্সার যদি মুত্রথলি অথবা মুত্রনালী আক্রমণ করে তখন রোগী প্রস্রাবের কষ্টে ভোগেন এবং বার বার প্রস্রাব হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার যৌনপথে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ঐ পথ দিয়ে রক্ত ও মিউকাস এমনকি মলও বেরিয়ে আসতে পারে।

বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ

* মলের সুপ্ত রক্ত পরীক্ষা * মলদ্বারের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা * প্রকটসিগময়ডোস্কপি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ * কোলোনসকপি * বেরিয়াম এনেমা * সি-ই-এ (কার্সিনোএম্রাইওনিক এন্টিজেন) * আল্ট্রাসনোগ্রাম অব লিভার * আইভিইউ এক্স-রে * পেটের সিটি স্ক্যান।

প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা

অপারেশনই এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা। এ রোগে ঐতিহ্যবাহী অপারেশন হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় ও মলদ্বার কেটে ফেলে পেটে নাভীর বাম দিকে কলোষ্টমি বা কৃত্রিম মলদ্বার তৈরি করে দেয়া। যেখানে একটি ব্যাগ লাগানো থাকে যার ভিতর মল জমা হতে থাকে। যখন রোগীকে এ জাতীয় অপাশেনের ধারণা দেয়া হয় তখন অনেক রোগীই বলেন যে, স্যার মরে যাব তবু এমন অপারেশন করাব না। এসব রোগী এরপর হাতুড়ে চিকিৎকের শরণাপন্ন হন অপারেশন ছাড়াই চিকিৎসার জন্য। কিছুদিন চিকিৎসার পর হতাশ হয়ে যখন ফিরে আসেন তখন সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তোলার অবস্থা আর থাকে না। তখন রোগী মিনতি করে বলেন যে, স্যার ভুল হয়ে গেছে এখন কিছু একটা করুন।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আমরা ৭০-৮০% রেকটাম ক্যান্সার রোগীর মলদ্বার না কেটেই অপারেশন করতে পারি। যার ফলে স্বাভাবিক পথেই পায়খানা করতে পারবেন। এ প্রযুক্তিটির নাম হচ্ছে Stapling Technique (Disposble Circular Stapler, Proximate ILS, Proximate Linear Stapler এবং Roticulator)। ইতোমধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী '৯৮ তারিখ আমি দেশের ঐতিহ্যবাহী হাসপাতাল হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে এরূপ একটি জটিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সফল অপারেশন করেছি। অপারেশনটি করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান, দেশের প্রখ্যাত সার্জন ও আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ডাঃ জিয়াউল হক। রোগীর বয়স ৫০। বাংলাদেশ বিমানের অফিসার। অনেকদিন মলদ্বারে রক্ত যাচ্ছিল। হঠাৎ পেট ফুলে যাওয়ায় তাকে জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন করে এই ক্যান্সারটি শণাক্ত করেন ডাঃ জিয়াউল হক। এ অপারেশনের জন্য একবার ব্যবহার যোগ্য দু'টি যন্ত্র আমরা সিঙ্গাপুর থেকে এনেছিলাম আগে ভাগেই। যন্ত্রটি কিছুটা ব্যয়বহুল। অপারেশনের সময় আমরা বৃহদান্ত্র ও রেকটামের নির্ধারিত অংশটুকু কেটে ফেলে দেই এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদান্ত্র ও রেকটামের অবশিষ্টাংশ সংযুক্ত করে দেই। তলপেটের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই যন্ত্র ছাড়া এ জাতীয় অপারেশন করা প্রায় অসম্ভব। বিগত নয় বৎসর আমরা এ জাতীয় অত্যাধুনিক অপারেশন অনেকগুলো করেছি। এ অপারেশনের পর সাধারনত পেটে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২-৩ মাসের জন্য একটি ব্যাগ লাগিয়ে দেয়া হয়। তিনমাস পর ঐ ব্যাগটি (কলোষ্টমী বা আইলিওষ্টমী) আবার অপারেশন করে বন্ধ করে দিতে হয়। তখন রোগী স্বাভাবিক মলদ্বার দিয়ে মলত্যাগ করতে পারেন। যখন রেকটামের ক্যান্সার খুবই গভীরে থাকে তখন হাত দিয়ে সেলাই করে খাদ্যনালী জোড়া লাগানো যায় বলে এই যন্ত্র ব্যবহার প্রয়োজন হয় না।

রেকটাম ক্যান্সার কেন হয় ?

ধনী লোকদের এ রোগ বেশী হয়। মদ্যপানও ধুমপান এর সম্ভাবনা বাড়ায়। খাবারে যথেষ্ট আঁশ জাতীয় উপাদান থাকলে, যেমন-সব্জি, ফলমুল এ রোগের সম্ভাবনা কমায়। চলি- শ বছর বয়সের পরে এই সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

পায়ুপথ ক্যান্সার: মলত্যাগের বিকল্পপথ কতটা জর"রি

পায়ুপথ বা রেকটাম ক্যান্সার একটি জটিল রোগ। এর লক্ষণ হচ্ছে টয়লেটে অল্প অল্প রক্ত যাওয়া, পায়খানার সাথে আম বা মিউকাস যাওয়া এবং পায়খানা ক্লিয়ার হয়নি এরূপ বোধ করা। বার বার পায়খানা হওয়া, পায়খানার সাথে মরা রক্ত ও পুঁজ যাওয়া এবং দুর্গন্ধ হওয়া। দীর্ঘ দিন চিকিৎসাবিহীন থাকলে মলত্যাগ করতে কষ্ট হওয়া। ঔষধ না খেলে পায়খানা না হওয়া, সবশেষে মলত্যাগ বন্ধ হয়ে পেট ফুলে ওঠা। ১৮ বছর থেকে শুর" হয়ে যে কোন বয়সে এটি হতে পারে। ১৮ বছরের নিচে খুব একটা দেখা যায় না। রোগীরা সাধারণত এ রোগটিকে পাইলস অথবা রক্ত আমাশয় হিসেবে ধরে নেন এবং দীর্ঘদিন টোটকা চিকিৎসার উপর নির্ভর করেন। ক্যান্সার যখন মলদ্বারে ছড়িয়ে পড়ে অথবা আশেপাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখনই মলদ্বারে ব্যথা হয়। ক্যান্সার বেশীদিন চিকিৎসাবিহীন থাকলে ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে যা দিয়ে মাঝে মাঝে পুঁজ বের হয়। ক্যান্সার যদি মূত্রথলি আক্রমণ করে তাহলে বার বার প্রসাব হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এ ক্যান্সার যোনী পথে ছড়িয়ে পড়লে ঐ পথ দিয়ে রক্ত, মিউকাস এমনকি মলও বেরিয়ে আসতে পারে। এ রোগ ধরার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মলদ্বারের ভিতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যেমন, সিগময়ডস্কপি, প্রকটস্কপি ও কোলনস্কপি। সন্দেহজনক হলে মাংস নিয়ে বায়োপসী পরীক্ষা করতে হয়।

রেকটাম ক্যান্সার কেন হয়?

ধনী লোকদের এ রোগ বেশি হয়। মদ্যপান ও ধুমপান এর সম্ভাবনা বাড়ায়। খাবারের যথেষ্ট আঁশ জাতীয় উপাদান থাকলে, যেমন ঃ সবজি, ফলমূল এ রোগের সম্ভাবনা কমায়। চলি- শ বছরের পর থেকে এর সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। এর ঐতিহ্যবাহী অপারেশন হচ্ছে রেকটাম ও মলদ্বার কেটে ফেলে দিয়ে নাভীর বাম পার্শ্বে একটি নতুন মলত্যাগের পথ করে দেয়া। যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় কলোস্টমি। এখানে একটি ব্যাগ লাগানো থাকে যার মধ্যে মল জমা হয় এবং দিনে ৩-৪ বার এটি পরিষ্কার করতে হয়। রোগীদেরকে যখন এ জাতীয় অপারেশনের ধারণা দেয়া হয় তখন অনেকেই বলেন যে, মরে যাব তবুও এ জাতীয় অপারেশন করাব না।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আমরা এ জাতীয় বেশির ভাগ রোগীকেই পেটে স্থায়ী ব্যাগ না লাগিয়ে অপারেশন করতে পারি। লেখক ১৬ মার্চ ১৯৯৮ থেকে এ জাতীয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির (স্ট্যাপলিং) অপারেশন করে আসছেন এবং ইতিমধ্যে এ জাতীয় সফল অপারেশনের জন্য বেশ কিছু রোগী পেটে স্থায়ী ব্যাগ লাগানোর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছেন। চিকিৎসকদের জন্য বলে রাখা ভাল যে আগে ধারণা ছিল মলদ্বারের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে যে ক্যান্সার স্পর্শ করা যায় তাকে স্থায়ী ব্যাগ লাগাতে হবেই। কিন্তু এ ধারণা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রসূল স্যার একজন মহিলাকে (৬৮) লেখকের কাছে পাঠান এই বলে যে এ রোগীর ক্যান্সার আংগুল দিয়ে স্পর্শ করা যায়। আপনি চেষ্টা করে দেখবেন যে তার ব্যাগ না লাগিয়ে অপারেশন করা যায় কিনা। আল-াহর রহমতে অত্যাধুনিক স্ট্যাপলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঁচ ঘন্টা অস্ত্রোপচার করে তাকে পেটে স্থায়ী ব্যাগ না লাগিয়ে সফল অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক রেকটাম ক্যান্সার সার্জারির নীতি হচ্ছে এই যে, সব রোগীকেই আমরা পেটে ব্যাগ না লাগিয়ে অপারেশনের চেষ্টা করি। পেট কেটে যদি দেখা যায় যে স্ট্যাপলিং করা যাবে তাহলে স্থায়ী কলোস্টমী এড়ানো যায়। আর যদি স্ট্যাপলিং ঐ রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা যায় তাহলে তাকে স্থায়ী ব্যাগ লাগাতে হবে।

মলদ্বারের বেশি ভিতরে ক্যান্সার হলে স্ট্যাপলিং প্রয়োজন হয় না। আবার ক্যান্সার ও মলদ্বারের মধ্যে কোনই গ্যাপ না থাকলে মলদ্বারসহ রেকটাম কেটে ফেলে দিতে হবে। আর সেক্ষেত্রেই শুধু কলোস্টমি অবশ্যম্ভাবী। তবে রোগীরা যদি সময়মত আসেন তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কলোস্টমী এড়ানো যায়।
পায়ুপথ ক্যান্সারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অপারেশন এখন সফলভাবে দেশেই হচ্ছে। অতএব এ জাতীয় অপারেশনের জন্য সম্মানিত রোগীদের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

রেকটাম ক্যান্সারঃ কেসহিস্ট্রি এবং স্ট্যাপলিং চিকিৎসা

আমাদের পরিপাকতন্ত্রের শেষ অংশটুকুকে আমার বলি রেকটাম বা মলাশয় ও মলদ্বার। এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় এর উপসর্গগুলি প্রায় এক রকম। রোগীর কথা শুনে কখনো রোগ নির্ণয় করা যায় না। যেমনঃ মলদ্বারে রক্ত যায় যেসব রোগে তারমধ্যে রয়েছে পাইলস, এনাল ফিশার, রেকটাম ক্যান্সার, ফিস্টুলা, পলিপ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ডাইভার্টিকুলোসিস, কোলাইটিস, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের এন্ডোসকোপিক পরীক্ষা ছাড়া কোন ডাক্তারের পক্ষে এগুলো সনাক্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে বৎসরে ১২-১৪ হাজার লোক বৃহদান্ত্র ও রেকটাম ক্যান্সারে আক্রান্ড় হন উন্নত দেশে এর হার ৭ গুণ বেশি। রেকটাম ক্যান্সারের উপসর্গই হচ্ছে পায়খানায় রক্ত যাওয়া, মাঝে মাঝে ডায়রিয়া আবার কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া, খুব সকালে মলত্যাগের বেগ হয়, পেটে ব্যথা হয় এবং পেট ফাঁপ দিয়ে ফুলে উঠতে পারে। দীর্ঘদিন থাকলে মলদ্বারে ব্যথা এবং প্রস্রাবে অসুবিধা হতে পারে। মলের সাথে আম বা মিউকাস যায় কোন কোন সময়। এ ক্যান্সার চিকিৎসার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো এটিকে পাইলস বা আমাশয় মনে করা, গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ ও হোমিও চিকিৎসায় গ্যারান্টি সহকারে ক্যান্সার নির্মূলের আশ্বাস, মহিলারা এ জাতীয় সমস্যা কাউকে বলতে বিব্রতবোধ করেন, অপারেশন ভীতি এবং পেটে কলোস্টমি করে ব্যাগ লাগাতে হবে এ ভয়।

রেকটাম ক্যান্সার রোগীদের জন্য সুখবর এবং অত্যন্ড় আশার কথা এই যে, যে কারণে আগে রোগীরা অপারেশন করতে রাজী হতেন না তা হলো পেটে স্থায়ী কলোস্টমী করা। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেশে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কলোস্টমি ছাড়া এই অপারেশন সফলভাবে সম্পাদন করেছি এ প্রযুক্তিতে দুটি যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় যা কিছুটা ব্যয়বহুল এবং একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। এ ধরনের অপারেশন সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে আমরা নিয়মিত করেছি। আমরা আশা করি, এ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে এখন ৭০-৮০% রেকটাম ক্যান্সার রোগী উপকৃত হবেন। রোগীরা যদি সচেতন হন এবং খুব আগে-ভাগে আসেন তাহলে খুবই কমসংখ্যক রোগীর কলোস্টমি করতে হবে। ইতিমধ্যে বহু ক্যান্সার রোগী দেখেছি যাঁরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ মোস্ড়ফা সিরাজুদ্দৌলা সাহেব একজন রোগী পাঠিয়েছেন। রোগীর বয়স ৫৫। বাড়ি নওগাঁ। ক্যান্সার বেড়ে গিয়ে মলদ্বারে বড় বড় গোটা হয়েছে। রক্ত মাত্র ২৮%। তাঁর স্ত্রী জানালেন, বিগত তিন বৎসর যাবত বসে ভাত খেতে পারেন না। তারপরও কত বললাম অপারেশন করতে; কিন্তু তিনি ভয়ে রাজী না। বলেন যে, কবিরাজ বলেছে ভাল হয়ে যাবে। যাহোক, অপারেশনের পর এখন তিনি বসে ভাত খেতে পারছেন। হয়েছেন সম্পূর্ণ সুস্থ্য।

অন্য একজন অল্পবয়সী রোগী এসেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজন তাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছেন। গায়ে রক্ত নেই, অসম্ভব শুকিয়ে গেছে, সারা শরীরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্বে শুধু

কলোস্টমি করা হয়েছে। আসল ক্যান্সার রয়ে গেছে। মলদ্বারে তিনটি ফিস্টুলা দিয়ে অনবরত ময়লা পড়ছে। কলোস্টমির মুখটি বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু মুখে দিলেই পেট ফুলে যায়। আমাকে অপারেশন করতে অনুরোধ করলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখলাম, অপারেশনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতঃপর বিভিন্ন ধরনের ব্যয়বহুল চিকিৎসা করে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে রোগীর বিশেষ অনুরোধে অপারেশন করে ক্যান্সারটি অপসারণ করি। এক্ষেত্রে তাকে অজ্ঞান না করেই অপারেশন করি, তবে পেট ও নিচের অংশ অবশ করা হয় অপারেশনের পর রোগী ভালভাবে খেতে পারছেন। ক্যান্সারটি অপসারণ করায় তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং রোগী বেশ খুশী হন। পুরানো ক্যান্সারে রোগী সাধারণত কয়েক বৎসরের বেশি বাঁচেন না। কিন্তু অপারেশনের পর যতদিন বাঁচেন ততদিন অনেকটা আরামে থাকেন।

অপারেশন করে ক্যান্সারটি অপসারণ না করলে রোগী বিভিন্ন জটিলতায় ভোগেন, যেমন গভীর রক্ত শূন্যতা এমনকি হঠাৎ বেশি রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেতে পারেন। মলদ্বার, কোমর ও পায়ে অনবরত ব্যথা, প্রসাবের অসুবিধা, মহিলাদের যোনীপথ দিয়ে রক্ত ও মল বের হওয়া, খেতে না পেরে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাওয়া, পেট ফুলে উঠা, পায়খানা করতে না পারা, কিডনি অকেজো হওয়া, লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি। রেকটাম ও মলদ্বারের বিশেষজ্ঞদের মতে, রেকটাম ক্যান্সার যত পুরাতনই হোক অপারেশন করতে হবে। এমনকি যদি ক্যান্সার লিভারে ছড়িয়ে গিয়ে থাকে অথবা যদি এমন মনে হয় যে, রোগী কয়েক মাসের বেশি বাঁচবেন না তবুও অপারেশন করতে হবে। তাতে রোগী যতদিন বেঁচে থাকেন আরামে থাকবেন এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। অপারেশনের পর রোগী কতদিন বেঁচে থাকবেন এ ব্যাপারটি আল-াহর উপর ছেড়ে দেয়াই ভাল। তবে ক্যান্সার লিভারে ছড়িয়ে গেলে তারপর অপারেশন করলেও অনেক রোগী ৩-৪ বৎসর বেঁচে থাকেন। অন্যদিকে যখন ক্যান্সার শুধু রেকটামে সীমাবদ্ধ থাকে তখন অপারেশন করলে ৯৩% রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যান।

ইতিমধ্যে দু'জন অল্প বয়সী মহিলা রোগী দেখেছি। বয়স ২০-২২ বৎসর। আড়াই বৎসর যাবত মলদ্বারের সমস্যা। কিন্তু লজ্জায় পরিবারের কাউকে বলেননি। এখন প্রচ- ব্যথা হওয়ায় সমস্যার কথা জানাতে বাধ্য হয়েছেন। পরীক্ষা করে এদের ক্যান্সার পাওয়া গেছে। কিন্তু রোগীদের ধারণা ছিল যে তাদের পাইলস হয়েছে।

একজন পুলিশ অফিসারের স্ত্রীও পার্শ্ববর্তী দেশে যান এ চিকিৎসার জন্য। রোগীর ভাষ্য অনুযায়ী ওখানকার ডাক্তার সাহেবরা তাঁকে আমার কাছে এসে চিকিৎসা করতে বলেছেন।

শেষ কথা ঃ রেকটাম ক্যান্সার শুর-তে ধরা পড়লে অপারেশনের ফলাফল খুবই ভাল। দেরিতে ধরা পড়লে অপারেশনের পর ক্ষেত্রভেদে রেডিও থেরাপী বা কেমোথেরাপী দেয়া যায়। আমি রোগীদেরকে অনুরোধ করতে চাই, সবকিছুকে পাইলস মনে করে বসে থাকবেন না। রেকটাম ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় অপারেশন করলে ৯৩% রোগী আরোগ্য লাভ করেন এবং বেশীর ভাগ রোগীর পেটে ব্যাগ লাগানো বা কলোস্টমী করা প্রয়োজন হয় না।

পায়ুপথ বা রেকটাম ক্যান্সার চিকিৎসা

পায়ুপথে বিভিন্ন রোগ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হচ্ছে ক্যান্সার। এই পথে ক্যান্সার হলে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয় যেমন, মল ত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন, খুব সকালে পায়খানার বেগ হওয়া, মল ত্যাগের পর আরও মল রয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি হওয়া, পায়খানার সাথে রক্ত ও মিউকাস বা আম যাওয়া, কিছুদিন পাতলা পায়খানা এবং এর পর কিছুদিন কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া, মলদ্বারে ব্যথা হওয়া ইত্যাদি। এ রোগটি সনাক্ত করতে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পাইলস সংক্রান্ড় বিভ্রান্ড়ির। মলদ্বারে বিভিন্ন রোগ হলেও এর অল্পবিস্ড়র পার্থক্যসহ উপসর্গগুলি প্রায় একরকম। শারীরিক পরীক্ষা না করে শুধু রোগীর কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলে রোগ নির্ণয়ে ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই যন্ত্র দিয়ে মলদ্বারের ভিতর পর্যবেক্ষণ করা যেমন, প্রকটস্কপি, সিগময়ডস্কপি, কোলনস্কপি, বেরিয়াম এনেমা পরীক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ড় জর"রী। পরীক্ষার মাধ্যমে এসব রোগ আগে ভাগে ধরতে পারলে চিকিৎসা সহজ ও কার্যকরী হয়। কথায় বলে 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। এখন মনে করা হয় যে বেশিরভাগ ক্যান্সারই এডেনোমাটাস পলিপ (ক্যান্সারে রূপান্ড়রিত হয় এমন পলিপ) থেকে উৎপত্তি হয়। এ রোগটি ক্যান্সারে পরিণত হবার আগে ধরতে পারলে চিকিৎসা অত্যন্ড় সহজ। আবার ক্যান্সারও যদি মাংস পেশীর গভীরে বিস্ড়ৃত হওয়ার আগেই ধরা পড়ে তাহলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে। অনেক লোকের ধারণা ক্যান্সার অপারেশন না করাই ভাল। অপারেশন করলে আরও ছড়িয়ে যায় এবং আরও ক্ষতি হয়। এ ধারণা কোথায় পেলেন জানি না। এখন পর্যন্ড় সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন অংগের ক্যান্সারের, যেমন পরিপাকতন্ত্র, লিভার, স্বরন, অস্থি, মগজ, চর্ম, ফুসফুস- প্রধান চিকিৎসাই হচ্ছে অপারেশন। বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সার হলে অপারেশনের সময় কতদূর পর্যন্ড় কাটতে হবে এবং কি কি অঙ্গ এর অন্ড়র্ভুক্ত করতে হবে তার নীতিমালা নির্ধারণ করা আছে। যাকে ক্যান্সার সার্জারির ভাষায় বলা হয় অনকোলজিক্যাল প্রিন্সিপালস অব সার্জারি। শুধুমাত্র ক্যান্সার আক্রান্ড় টিস্যু টুকু কেটে ফেলে দিলেই ক্যান্সার অপারেশন যথার্থ হয় না। ক্যান্সার যে পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে সেই অংশ ও মূল ক্যান্সারের সাথে কেটে ফেলে দিতে হবে। এর পরেও যদি সন্দেহ থাকে যে ক্যান্সার কোষ সম্ভবতঃ আরও দূরে বিস্ড়ৃতি লাভ করেছে কিন্তু সেই অঙ্গটি কেটে ফেলে দেয়া সম্ভব নয় তাহলে ক্ষেত্রভেদে কেমোথেরাপী বা রেডিওথেরাপী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এগুলির চিকিৎসার জন্য মেডিকেল অনকোলজিস্ট ও রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট রয়েছেন।

রেকটাম ক্যান্সার হলে এর প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে জলদি অপারেশন করে ফেলা। এমনকি যদি রোগী আর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে থাকবেন বলে মনে হয় তবুও অপারেশন করা উচিত। এতে জীবন ধারণের গুণগত উন্নতি হয়। এবং রোগীর ভোগান্ড়ির অনেকটা লাঘব হয়। এই কান্সার চিকিৎসার একটি অতীব গুর"ত্বপূর্ণ দিক হল এ অপারেশনের পরে পেটে কলোস্টমি করে ব্যাগ লাগাতে হবে কিনা। রেকটামের খুব গভীরে ক্যান্সার হলে

পেটে মলত্যাগের ব্যাগ লাগানোর সাধারণত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রেকটামের নিচের দিকে অর্থাৎ মলদ্বারের খুব কাছাকাছি ক্যান্সার হলে পেটে কলোস্টমি করা বা ব্যাগ লাগানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং কখনো কখনো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে কৌশলগত সমস্যাটি হচ্ছে ক্যান্সারে আক্রান্ড় রেকটামের অংশটুকু কেটে ফেলার পর পরিপাকতন্ত্রের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উপরে থাকে বৃহদান্ত্র এবং নিচে থাকে রেকটাম ও মলদ্বারের অবশিষ্টাংশ। পেলভিস বা তলপেটের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিপাকতন্ত্রের দুটি অংশ হাত দিয়ে সেলাই করে জোড়া দেয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এজন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাপলিং যন্ত্র বানিয়েছেন যেমন গোলাকার স্ট্যাপলার, লিনিয়ার স্ট্যাপলার, রোটিকুলেটর ইত্যাদি। এসব যন্ত্রের সাহায্যে হাত দিয়ে সেলাই সম্ভব নয় এমনসব ক্ষেত্রে রেকটাম ও বৃহদান্ত্র জোড়া দেয়া সম্ভব। ফলে পেটে স্থায়ীভাবে কলোস্টমী করে ব্যাগ লাগানো দরকার হয় না। উন্নত দেশে এ যন্ত্রের সাহায্যে রেকটাম ক্যান্সারের সিংহভাগ অপারেশন করা হয় কারণ আর্থিক খরচের ব্যাপারটি তাদের কাছে অতটা গুর"ত্বপূর্ণ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি মাত্র সার্কুলার স্ট্যাপলার ব্যবহার করা যথেষ্ট, কিন্তু মলদ্বারের খুব কাছাকাছি টিউমার হলে দুটি স্ট্যাপলার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এ যন্ত্রগুলি বিভিন্ন আকৃতি ও সাইজের হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে বহু রেকটাম ক্যান্সার রোগী এ পদ্ধতিতে অপারেশন করেছি। রাজশাহীতে ব্যাংকের মহিলা অফিসার। তার বিগত ১৪ বৎসর যাবত পায়খানায় রক্ত যেত। প্রচর রক্ত গেছে পায়খানার সাথে। বেশ কয়েকবার রক্ত দিতে হয়েছে। সম্ববতঃ তার বহু বৎসর যাবৎ পলিপ নামক বিনাইন টিউমার ছিল যা বহু বৎসর থাকার ফলে ক্যান্সারে রূপান্ড়রিত হয়েছে। মহিলার একমাত্র আকুতি ছিল পেটে যেন স্থায়ী ব্যাগ লাগানো না লাগে। তার পেটে কোনরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী কলোস্টমী না করেই অপারেশন করেছি। এ অপারেশনে দুটি স্ট্যাপলার ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সার্কুলার স্ট্যাপলার অন্যটি রোটিকুলেটর। অপারেশনের চার দিন পর তিনি খাওয়া দাওয়া এবং পায়খানা করতে পেরেছেন। অন্য কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই তিনি সময়মত হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন এবং এখনো ভাল আছেন। রোগীরা যদি খুব আগে ভাগে আসেন তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কলোস্টমি না করে অপারেশন করা যায়। তবে প্রধান অন্ড়রায় হচ্ছে সবকিছুকে পাইলস বা রক্ত আমাশয় মনে করে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দেয়া। যার ফলে ক্যান্সার বিস্ড়ৃতি লাভ করে এবং চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলার সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

ক্রনিক আমাশয় বা আইবিএস (ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম)

এক তর"ণের বয়স ২২ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আধুনিক এক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে এক জটিল রোগে আক্রান্ড়। যা তার পড়াশুনা ও জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। ৬ মাস ধরে সে আমাশয়ে ভুগছে। দিনে ৪/৫ বার টয়লেটে যেতে হয়। তলপেটে ব্যাথা হয়, পায়খানার সাথে মিউকাস বা আম যায়। টয়লেট থেকে আসার পরও মনে হয় পুরো পুরি পরিস্কার হয়নি এবং মাঝে মাঝে পায়খানার সাথে রক্ত যায়। এসব সমস্যার জন্য নিজে নিজে অনেক ঔষধ খেয়েছেন এবং অনেক ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন। অনেক রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে সে খুবই চিন্ড়াগ্রস্ড় হয়ে পড়ে। সে ভাবতে থাকে এ সমস্যার কি কোন সমাধান নেই, নাকি এটা পায়ুপথের কোন জটিল সমস্যা, না ক্যান্সার। উপরের বর্ণনা থেকে আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন এটা কি ধরনের রোগ? এর কি কোন চিকিৎসা এদেশে নেই?

আজ আমরা যে রোগটি নিয়ে আলোচনা করতে যাব তার নাম হচ্ছে Irritable Bowel Syndrom (IBS) বা সহজ বাংলায় যাকে বলা যায় মানসিক অস্থিরতাজনিত আমাশয় রোগ। জেনারেল প্রাকটিশনার থেকে শুর" করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে পরিপাকতন্ত্রের এই সমস্যা নিয়ে প্রচুর রোগী আসেন। পরিপাকতন্ত্রের এই বিশেষ রোগ নিয়ে গবেষণার কোন অন্ড় নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ড় এই রোগের কোন স্বীকৃত কারণ পাওয়া যায়নি। এজন্য একে Functional disorderও বলা হয়।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯-১২% এই রোগের আক্রান্ড়। পুর"ষ বা মহিলা যে কেউ এই রোগে আক্রান্ড় হতে পারে। অনুপাত ১০ঃ১১। এই রোগের কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। যে কোন বয়সের যে কেউ এই রোগে আক্রান্ড় হতে পারে।

IBS রোগের নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা না গেলেও বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ব্যাপারকে এ রোগের জন্য দায়ী বলে মনে করেন। যেমন ঃ মানসিক কারণ, পরিপাকতন্ত্রের পরিবর্তিত চলাচল, পরিপাকতন্ত্রের প্রসারণ সংক্রান্ড় জটিলতা ইত্যাদি। এসব কারণের মধ্যে ৫০% রোগীই মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যেমন ঃ উত্তেজনা, দুচিন্ড়া, অবসাদগ্রস্থতা, ভয় পাওয়া, মানসিক বিপর্যস্ড়তা ইত্যাদি। পরিপাকতন্ত্রের পরিবর্তিত আচরণ আরেকটি উলে- খযোগ্য কারণ।

এই রোগে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তাদের আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা অন্যটি হলো অন্যান্য শারীরিক সমস্যা। পরিপাকতন্ত্রের সমস্যাগুলো হলো তলপেটে ব্যাথা যা টয়লেটে যাবার পর কমে যায়, পেট ফুলে ওঠা। IBS রোগীরা দুই ধরনের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারদের কাছে আসতে পারে। এক ধরনের রোগীরা আসে ডায়রিয়াজনিত সমস্যা এবং অন্য এক ধরনের রোগীরা আসেন কোষ্ঠকাঠিন্যজনিত সমস্যা নিয়ে। আবার অনেক রোগী আসেন যাদের এই দুই ধরনের সমস্যাই

থাকে। যেসব রোগী ডায়রিয়াজনিত সমস্যা নিয়ে আসেন তারা প্রায়ই ঘন ঘন টয়লেটে যাওয়া, পরিস্কার ভাবে পায়খানা না হওয়া, আম যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গের কথা বলেন। আর যারা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, পায়খানার রাস্ড়ায় ব্যাথা ও পেটে ব্যাথা এসব সমস্যায় ভুগেন। IBS - এর অনেক রোগী অনেক সময় মলদ্বারের বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগে থাকেন। IBS - এর বেশীর ভাগ মহিলা ও পুর"ষ রোগীরা আবার এনাল ফিশার রোগে ভুগে থাকেন। অনেকে পাইলস রোগে আক্রান্ড় হন। এনাল ফিশার বা পাইলস রোগে আক্রান্ড় হলে পায়খানার রাস্ড়া দিয়ে রক্ত যেতে পারে। পায়খানার রাস্ড়া ফুলে উঠতে পারে, পায়খানার পর জ্বালা-যন্ত্রণা বা ব্যাথা করতে পারে। অথবা পায়খানার রাস্ড়া বের হয়ে আসতে পারে। উপসর্গের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় অত্যন্ড় উলে- খযোগ্য যে, রোগীর বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ার পর রোগের উপসর্গ প্রকটভাবে দেখা দেয়। বেশ কিছু খাবার রয়েছে যেমন ঃ গর"র দুধ, মাংস, চিংড়ি মাছ, তৈল জাতীয় খাবার বা মসলাবহুল খাবার। এসব খাবার খেলে রোগীদের পেট ব্যাথা, পাতলা পায়খানা দেখা দেয়।

IBS রোগ নিরূপনের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। যেমন ঃ রক্ত পরীক্ষা, মলদ্বারে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা (কলোনস্কোপি, সিগময়ডোস্কপি), বিশেষ এক্সরে করা যেতে পারে। কলোনস্কোপি, সিগময়ডোস্কপি অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে করানো উচিত। কারণ অনেক সময় মলদ্বার ও বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার রোগীরাও একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারদের কাছে আসতে পারে। বিশেষ ধরনের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে থাইরয়েড হরমোহন পরীক্ষা, মল পরীক্ষা, দুধ সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা ইত্যাদি।

IBS রোগের চিকিৎসার অন্যতম প্রধান ধাপ হলো রোগীকে আস্বস্ড় করা। বেশীর ভাগ রোগীই মনে করে তাদের ক্যান্সার হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ফলে তাদের রোগের উপসর্গ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। প্রত্যেক রোগীকে অবশ্যই যথেষ্ট সময় দিতে হবে। ধৈর্য্য সহকারে তাদের সব সমস্যা কথা শুনতে হবে, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে এটা দেহের কোন অঙ্গের রোগ নয়, এটা অনেকটা মানসিক অস্থিরতা ও অন্ত্রের উল্টাপাল্টা আচরনের ফল। যেসব রোগী এসব উপদেশের পরও আশস্ড় না হয় কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক রোগীর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে ইতিহাস(History) নিতে হবে। যেসব রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য ধরনের IBS রোগের বর্ণনা দিবে, তাদের ক্ষেত্রে খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আঁশযুক্ত খাবার আছে কিনা, নিয়মিত ব্যায়াম করেন কিনা এবং টয়লেটে যথেষ্ট সময় দেন কিনা এ ব্যাপারে ইতিহাস(History) নিতে হবে। এসব রোগীর খাদ্যে আঁশযুক্ত খাবার বেশী করে খেতে বলতে হবে যেন কোষ্ঠকাঠিন্য কমে আসে। অন্যদিকে যেসব রোগীর ডায়রিয়াজনিত IBS থাকে তাদের খাদ্যের তালিকা হতে অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাবার, ফল এবং চা ইত্যাদি কম করে খেতে বলতে হবে। এছাড়াও যেসব খাবার খেলে যেমনঃ দুধ, পোলাও, চিংড়ি, খেলে যাদের সমস্যা হয়, তা খাদ্য তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার বাদ দিলে তারা বেশ ভাল থাকেন।

রোগীদের কিভাবে দুঃচিন্ড়া, অবসাদগ্রস্থতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সব শিক্ষা দিতে হবে। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একজন রোগীকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। আচরণগত সংশোধন এবং শিথিলায়ন অনেকক্ষেত্রে রোগীকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

যেসব রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝিয়ে বলা এবং আশস্ড় করার পরও উপসর্গ পুরোপুরি না যায়, কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এসব ঔষধের বেশীর ভাগই হলো তল পেটের ব্যাথানাশক ঔষধ এবং অবসাদ, হতাশা দূর করার ঔষধ। ব্যাথা নাশক ঔষধ অন্ত্রের মাংস স্ড়রের উপর কাজ করে এর কর্মক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফলে ব্যাথা কম হয় ও ডায়রিয়া ভাল হয়। হতাশাদূরকারী ঔষধ IBS রোগীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ড় কার্যকর। যেসব রোগীর খুব ঘন ঘন বাথর"মে যেতে হয় বা পায়খানা এলে ধরে রাখতে পারেন না কেবল তাদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া প্রতিরোধকারী ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য ধরনের IBS রোগীদের ক্ষেত্রে আঁশ জাতীয় খাবারের পাশাপাশি ইসুবগুলের ভুষি খাবার জন্য উপদেশ দেয়া হয়।

অনেক রোগী যার IBS এর পাশাপাশি মলদ্বারে বিভিন্ন সমস্যা যেমন এনাল ফিশার বা পাইলস বা মলদ্বার বের হয়ে আসা রোগে আক্রান্ড় হয় তাদের অবশ্যই বৃহদন্ত্র ও মলদ্বারের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরনাপন্ন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশেই সব ধরনের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, এটি একটি মস্ড়িষ্ক এবং অন্ত্রের সংযোগজনিত রোগ। এর চিকিৎসা আছে এবং তা সোজা। দৈনন্দিন খাদ্যাভাস কিছুটা পরিবর্তন, দুঃচিন্ড়ামুক্ত জীবনযাপন করেই যে কেউ এ রোগ থেকে নিস্ড়ার পেতে পারেন। এরপরও যদি সমস্যা থাকে তাহলে রোগীদের অবশ্যই এ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য : আড়ালে মারাত্মক ব্যাধিও থাকতে পারে

হেদায়েত সাহেবের বয়স চলি-শের মতো, ভাল চাকরি করেন। হঠাৎ করে বেশ কিছু দিন যাবৎ তার শক্ত পায়খানা হচ্ছে, পায়খানায় দীর্ঘ সময় বসে থাকার পরও মনে হচ্ছে পায়খানা ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না, তাকে খুবই বিষণ্ন মনে হচ্ছে দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, পায়খানার সাথে রক্ত যায় কিনা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল - খেয়াল করিনি স্যার। তারপর তাকে পরীক্ষা করলাম, প্রোক্টোস্কোপি ও সিগময়ডোস্কোপি টেস্ট করলাম, তারপর দেখতে পেলাম তার কোলনে অর্থাৎ অন্ত্রনালীতে ক্যান্সার।

হেদায়েত সাহেব যে উপসর্গগুলো নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন তা মূলত কোষ্ঠকাঠিন্যের। কিন্তু এ কোষ্ঠকাঠিন্য কি, কেন হয়? তা আমরা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি এবং সময়মতো এর চিকিৎসা না করলে কি কি পরিণতি হতে পারে সে বিষয়েই এখন আমরা আলোচনা করব।

কেউ যদি প্রতি সপ্তাহে তিন বারের কম পায়খানায় যায়, পর্যাপ্ত পরিমাণ আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করার পরও, তখনই একে বলব কোষ্ঠকাঠিন্য।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ ঃ

১. আঁশ জাতীয় খাবার এবং শাকসবজি ও ফলমূল কম খেলে;
২. পানি কম খেলে;
৩. দুশ্চিন্ড়া করলে;
৪. কায়িক পরিশ্রম, হাঁটা-চলা কিংবা ব্যায়াম একেবারেই না করলে;
৫. অন্ত্রনালীতে ক্যান্সার হলে;
৬. ডায়েবেটিস হলে;
৭. মস্ড়িষ্কে টিউমার হলে এবং মস্ড়িষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে;
৮. অনেক দিন বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে বিছানায় শুয়ে থাকলে;
৯. বিভিন্ন ধরনের ঔষধ সেবন, যেমনঃ

ক. ব্যাথার ঔষধ;
খ. উচ্চ রক্ত চাপের ঔষধ;
গ. গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ;

ঘ. খিঁচুনির ঔষধ এবং

ঙ. যে সমস্ড় ঔষধের মধ্যে আয়রন, ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় খনিজ পদার্থ থাকে। তাছাড়া স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার জন্যও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এর মধ্যে কাঁপুনিজনিত অসুখ, স্নায়ু রজ্জু আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কিডনির দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা ও থাইরয়েডের সমস্যা উলে- খযোগ্য।

কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ ঃ

১. শক্ত পায়খানা হওয়া;
২. পায়খানা করতে অধিক সময় লাগা;
৩. পায়খানা করতে অধিক চাপের দরকার হওয়া;
৪. অধিক সময় ধরে পায়খানা করার পরও পূর্ণতা না আসা;
৫. মলদ্বারের আশেপাশে ও তলপেটে ব্যাথার অনুভব করা এবং
৬. আঙ্গুল কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে পায়খানা বের করা।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায় ঃ

১. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য বেশী করে শাক-সবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে;
২. বেশী করে পানি খেতে হবে;
৩. দুশ্চিন্ড়া দূর করতে হবে;
৪. যারা সারা দিন বসে বসে কাজ করেন তাদেরকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে এবং
৫. যে সমস্ড় রোগের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তার চিকিৎসা করতে হবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসা না করা হলে যে সমস্যা হতে পারে ঃ

১. পায়খানা ধরে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে;
২. পাইলস;
৩. এনাল ফিশার;
৪. রেকটাল প্রোলাপস বা মলদ্বার বাহিরে বের হয়ে যেতে পারে;
৫. মানসিকভাবে রোগাক্রান্ড় হবার প্রবণতা থাকে;
৬. প্রসাব বন্ধ হতে পারে;
৭. খাদ্য নালীতে প্যাঁচ লেগে পেট ফুলে যেতে পারে;
৮. খাদ্য নালীতে আলসার বা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে এবং
৯. কোষ্ঠকাঠিন্য যদি কোলন ক্যান্সার এবং মস্ড়িষ্কে টিউমারের জন্য হয় এবং সময় মতো চিকিৎসা করা না হয় তবে অকাল মুত্যুও হতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অনেকে প্রতিনিয়ত পায়খানা নরম করার বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, সিরাপ এবং মলদ্বারের ভিতরে দেয়ার ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন, যা মোটেও উচিত নয়। প্রতিনিয়ত পায়খানা নরম করার ঔষধ ব্যবহার করলে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় ফলে মলদ্বারে স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা আর থাকে না। তাই বয়স্ক এবং যারা পরিশ্রমের কাজ করেন না, এদের মধ্যে যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তাদের উচিত কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ নির্ণয় করে সে হিসাবে চিকিৎসা নেয়া। তবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য ইসুবগুলের ভুষি পানিতে ভিজিয়ে

সাথে সাথে খেয়ে ফেললে এবং গর, খাশি ও অন্যান্য চর্বিযুক্ত খাবার যেগুলো মল শক্ত করে তা থেকে দূরে থাকলে অনেকে উপকৃত হতে পারেন।

আলসারেটিভ কোলাইটিস : কখন অপারেশন প্রয়োজন

পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকাতে এ রোগ দেখা গেলেও উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে ছিল কদাচিৎ। তবে বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলোর খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি অণুকরনের ফলে আমাদের দেশের জনগণের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস। এ রোগটি সাধারণত ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মাঝামাঝি লোকজনের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। আলসারেটিভ কোলাইটিস ঠিক কাদের হয় তার কারণ সঠিকবাবে জানা যায়নি। তবে মামাতো, চাচাতো, খালাতো ও ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে কেউ কেউ মনে করেন কোলনের অন্ত্রগাত্রের আবারণ যদি দুর্বল হয় তবে এ রোগ হতে পারে।

কেউ যদি খুবই দুশ্চিন্তায় ভোগে, দুধ কিংবা দুগ্ধ জাতীয় খাবার খায় অথবা আমাশয়ে ভোগে তবে আলসারেটিভ কোলাইটিসের উপসর্গগুলো বার বার দেখা দিতে পারে।

উপসর্গসমূহ ঃ

১. ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া;
২. পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া;
৩. অনেক সময় এমনিতেই মলদ্বার দিয়ে মিউকাস কিংবা আম জাতীয় পদার্থ বের হওয়া;
৪. রক্ত যাওয়া;
৫. তল পেটে মোচড় দেওয়া এবং সাথে সাথে প্রচন্ড পায়খানার বেগ অনুভব হওয়া;
৬. সময়মতো বাথরুমে যেতে না পারলে;
৭. পায়খানা হয়ে কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং
৮. ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও রক্ত যাবার ফলে রোগীর পানি, লবণ এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেওয়া ইত্যাদি।

সময়মতো চিকিৎসা না করলে কি হতে পারে ঃ

১. কোলনে ক্যান্সার হতে পারে;

২. দেহের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যাথা হতে পারে, যেমনঃ কোমড়ে, মের"দন্ডে, হাঁটুতে, পায়ের গোড়ালীতে, হাতের জয়েন্টে;
৩. চামড়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লাল দাগ অথবা আলসার হতে পারে;
৪. চোখের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহজনিত রোগ হয়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে;
৫. মুখ, হাত ও পায়ে পানি এসে শরীর ফুলে যেতে পারে এবং
৬. জন্ডিস হতে পারে, লিভারের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

ঔষধ ঃ সাধারণত স্টেরয়েড ও সালফাসেলাজিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয় তবে মাঝে মধ্যে হাইড্রোকরর্টিসন, এজাথায়েপ্রিন অথবা সাইক্লোসপোরিন জাতীয় ঔষধও ব্যবহার করা হয়।
এ সমস্ড় ঔষধ দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহার করলে অনেকের মুখ ও শরীর ফুলে যেতে যেতে পারে, মাথার চুল পড়ে যেতে পারে, অনিদ্রা, অর"চি, হাতে-পায়ে জ্বালা-পোড়া, বমি বমি ভাবসহ নানাবিধ শারীরিক অসুবিধা হতে পারে।

অপারেশন ঃ আলসারেটিভ কোলাইটিসের স্থায়ী চিকিৎসা হতে পারে অপারেশন, তবে সব রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশনের দরকার হয় না।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপারেশন প্রযোজ্য ঃ

১. রোগীর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হলে, যেখানে দীর্ঘ মেয়াদী ঔষধ ব্যবহারের পরও কোন উন্নতি হয় না;
২. রোগী যদি ঘন ঘন পায়খানায় যেতে যেতে হাঁপিয়ে ওঠেন, পায়খানা ধরে রাখতে না পারেন কিংবা রক্তশূণ্যতায় ভোগেন;
৩. দীর্ঘ মেয়াদী স্টেরয়েড ব্যবহার করার পরও যখন স্টেরয়েডে আর কাজ করে না বরং স্টেরয়েড ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন;
৪. কোলোনোস্কোপি বা সিগময়ডোস্কোপি করার পর যখন ক্যান্সার ধরা পড়ে।

এ অপারেশনের পর পেটে স্থায়ীভাবে মলত্যাগের ব্যাগ লাগাতে হবে কিনা এটি একটি বড় প্রশ্ন। আজকাল জটিল বিশেষ ধরনের অপারেশন করে পেটে স্থায়ী মলত্যাগের ব্যাগ (আইলিওস্টমি) না লাগিয়েও অপারেশন করা যায়। এ অপারেশন করতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং বিশেষভাবে পারদর্শিতার প্রয়োজন হয়।

পাইলোনিডাল সাইনাস (দুই নিতম্বের মাঝখানে নালী)

সাধারনত এই রোগ মলদ্বারের পিছনে এবং উপরের দিকে হয়। ইহাতে মাঝে মাঝে পুঁজ হয়, ফুলে উঠে, ব্যথা করে এবং এর এক বা একাধিক মুখ থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশেও এই রোগ হতে পারে। এই রোগ সাদা চামড়ার লোকদের বেশী হয় এবং পুর"ষদের বেশী হয়। যাদের শরীর ঘনলোমে ঢাকা এদের মধ্যে পাইলোনিজল সাইনাস প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এই রোগ সাধারণত ১৫-৪০ বছর বয়সী লোকদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তবে ১৬-২০ বছর বয়সী লোকেরা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ড় হয়।

এই রোগের কারনঃ

পূর্বে ধারণা করা হতো ইহা জন্মগত সমস্যার কারনে হয়। তবে বর্তমানে মনে করা হয় এই রোগ কোন জন্মগত ত্র"টি নয়। ইহার কারণ, অত্যাধিক লোম এবং লোমকুপে আটকে পড়া লোম যা পরবর্তীতে পূজ এবং গর্তের সৃষ্টি করে।

উপসর্গ সমূহঃ

মলদ্বারে পিছন দিকে দুই নিতম্বের মাঝখানে (কথ্যভাষায় ফান্দি বলে) মাঝে মাঝে ব্যাথা হওয়া, ফুলে যাওয়া, ফেটেঁ পূজ পড়া এবং এক বা একাধিক মুখের সন্ধান লাভ।

চিকিৎসাঃ

এই রোগ সাধারণত অপারেশন ব্যথীত ভালো হয় না এবং অপারেশনের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পূনরায় হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অপারেশনের পর নিয়ম মত ড্রেসিং করতে হবে এবং আশ পাশের যায়গা ৭ দিন পর পর সেভ করতে হবে।

কলোষ্টমী বা আইলিওষ্টমী (বিভিন্ন রোগে পেটে মলত্যাগের বিকল্প পথ বা মলত্যাগের ব্যাগ লাগানো)

বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য মলত্যাগের বিকল্প পথ বা পেটে মলত্যাগের ব্যাগ লাগানো। আমাদের খাদ্যনালী মুখ থেকে শুর“ হয় এবং বুকের ভিতর হয়ে পেটে ঢোকে। এরপর পেটে পাকস্থলী, অসংখ্যবার পেচানো নাড়ীভুড়ি যেটিকে বলা হয় ক্ষুদ্রান্ত্র বা **Small intestine,** এরপর পেটের নিচে ডান দিকে শুর“ হয় খাদ্যনালীর মোটা অংশ যাকে বলা হয় বৃহদান্ত্র বা **Large intestine/bowel**। এই বৃহদান্ত্র পেটের ডান দিক থেকে সোজা উপরে ওঠে। এরপর লিভারের নিচ থেকে সোজা বাম দিকে চলে যায় প-ীহা **(Spleen)** পর্যন্ড়। সেখান থেকে আবার সোজা নিচে নেমে যায় এবং তল পেটে ঢুকে যায় যাকে আমরা বলি মলাশয় বা পায়ুপথ **(Rectum)**। তলপেটের সর্বনিম্নে গিয়ে এটি একটি সর“ পথে শেষ হয় যাকে আমরা বলি মলদ্বার **(Anus)**। মলদ্বার মাত্র দেড় ইঞ্চি লম্বা। এর ভিতর রেকটাম ৫ ইঞ্চি বা ১২ সেঃমিঃ লম্বা।

আমরা যে খাবার খাই তা এই খাদ্যনালী বা পরিপাকতন্ত্রের ভিতর হজম হয়। খাবারের প্রয়োজনীয় অংশ আমাদের রক্তে চলে যায় শক্তি ও বৃদ্ধির জন্য। অপ্রয়োজনীয় অংশ পায়খানা বা মল হিসাবে বৃহদান্ত্রের ভিতর থাকে। যখন পরিমাণ বেশী হয়ে যায় তখন সয়ংক্রিয়ভাবে আমরা মলত্যাগের তাড়না অনুভব করি। এভাবেই মলত্যাগ হয়।

অতএব, আমরা বুঝতে পারছি এই যে আমরা যা খাই তা এই ২৫-৩০ ফুট লম্বা খাদ্যনালীর ভিতর হজম প্রক্রিয়া শেষে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়।

আমাদের এই খাদ্যনালীর কোথাও যদি কোন রোগ হয় তখন আমরা আক্রান্ড় অংশটুকু কেটে ফেলে দিয়ে এটিকে আবার জোড়া দিয়ে দেই। জোড়া দেবার পর খাবার খাই এবং এই খাবার জোড়া লাগানো অংশ অতিক্রম করার সময় জোড়া ছিড়ে যেতে পারে অথবা লিক করে পেটের ভিতর হজম করা খাবার বা মল বের

হয়ে যেতে পারে। এই কারনে আমরা জোড়া লাগানো অংশের স্বাভাবিক ভাবে জোড়া লাগার স্বার্থে পেটে ছিদ্র করে খাদ্যনালীকে বাহিরে নিয়ে আসি যাতে পায়খানা জোড়া লাগানো অংশে পৌছার পূর্বে পেটের বাইরে চলে আসে।

এছাড়া যখন রেকটাম বা মলদ্বারে কোন রোগ হয় বিশেষ করে ক্যান্সার তখন মলদ্বার সম্পূর্ণ ফেলে দিতে হলে মলত্যাগের বিকল্প পথ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে পেটে নাভির বাম পাশে পেটে ছিদ্র করে কলোষ্টমী বা মলত্যাগের বিকল্প পথ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক ষ্ট্যাপলিং যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা কলোষ্টমী ছাড়া অপারেশন করতে পারি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হয় না।
মলত্যাগের বিকল্প পথ কখনও স্থায়ী আবার কখনও অস্থায়ী করা হয়। স্থায়ী হলে সেটি সারা জীবন থাকবে। অস্থায়ী হলে ২-৩ মাস পর আবার অপারেশন করে এটি বন্ধ করে দিতে হয়।

যে কোন রোগীই পেটে মলত্যাগের ব্যাগ লাগাতে হবে শুনলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু এটিও বুতে হবে যে ক্যান্সার অপারেশন না করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং বহু জটিলতা হবে। আর অপারেশন ফল খুবই ভাল হবে যদি রোগী তাড়াতাড়ি আসেন। যদি রোগ দীর্ঘ দিনের হয় তাহলে অপারেশন করার উপকার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রোগ ধরা পড়ার সাথে সাথে অপারেশন করলে ক্যান্সার থেকে সারা জীবনের জন্যও আরোগ্য লাভ সম্ভব।

পায়ুপথে ক্যান্সার হলে পেটে ব্যাগ লাগানোর বিষয়টি কি শুধু আমাদের দেশেই হয় না উন্নত দেশেও হয়? আমরা যে ক্ষেত্রে মলত্যাগের বিকল্প পথের উপদেশ দেই সেক্ষেত্রে বিদেশেও তাই করতে হবে। কারণ এব্যাপারে যে কোন উন্নত ধরনের ষ্ট্যাপলিং পদ্ধতির অপারেশন আমি এদেশে ১৯৯৮ সন থেকে করে আসছি।

উন্নত দেশের একটিই সুবিধা আর তাহল সেদেশের রোগীরা যেদিন দেখবে যে মলত্যাগের সময় এক ফোটা রক্ত যাচ্ছে তারা সাথে সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনে নেবে যে এটি পাইলস না কি ক্যান্সারের কারণে হচ্ছে। এরূপ প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার ধরতে পারলে ৮০-৯০% রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। অন্যদিকে আমাদের দেশের চিত্র কি? পায়খানার সাথে আম বা মিউকাস অথবা রক্ত গেলে, পায়খানা ক্লিয়ার হয় না, বারে বারে পায়খানা হয়, মলদ্বারে ব্যাথা হয় ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে রোগীরা ফার্মেসী থেকে ঔষধ কিনে খান আমাশয় অথবা পাইলস হয়েছে এই ভেবে। অনেক চিকিৎসক ও ভাবেন আমাশয় অথবা পাইলস বা অর্শ হয়েছে। তাই তারাও এজাতীয় ঔষধ দেন। চিকিৎসকরা যদি মলদ্বারের এই উপসর্গের কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে রোগের ধরন নির্ধারন না করেই পরামর্শ দেন তাহলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। কারণ তখন রোগী নিশ্চিন্তে থাকেন এবং মাঝে মাঝে নিজেই আগের ঔষধ খেতে থাকেন। যখন অবস্থা খুব খারাপ হয়,

দৈনিক ১০-১২ বার পায়খানা হয়, ব্যাথা হয়, পায়খানা আটকে যায়, পেট ফুলে ওঠে, প্রচুর রক্ত আম যায়, তখন বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যেতে থাকেন সমস্যা সমাধানের জন্য। এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞ সার্জনগন যদি তার মলদ্বারে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন তখনই ক্যান্সার ধরা পরে। তবে এতদিনে ক্যান্সার এত বিস্তৃতি লাভ করেছে যে অপারেশন করে এ অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী আরোগ্য লাভ নাও হতে পারে।

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি মলদ্বারের বিভিন্ন উপসর্গ ও রোগকে মামুলিভাবে অবহেলা না করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে আসলে রোগটি কি? ক্যান্সার না তো? কিন্তু সব রোগীই মনে করেন তার পাইলস অথবা আমাশয় হয়েছে। এ মানসিকতার কারনেই যত অঘটন ঘটে।
পেটে ব্যাগ লাগানোর বিষয়টিকে রোগীরা যত ভয়ংকর মনে করেন আসলে তা কিছুই নয়। খাদ্যনালীর শেষ অংশটি পেটের দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। একটি ব্যাগ এর মুখে লাগিয়ে দেয়া হয়। যাতে মল বের হলে ব্যাগের ভিতর জমা হবে। রোগী এই ব্যাগটি মাঝে মধ্যে পরিস্কার করে নিবেন। এই ব্যাগসহ তিনি শার্ট ইন করে প্যান্ট পড়তে পারবেন। অফিস আদালতে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন, ডুব দিয়ে গোসল করতে পারবেন, যে কোন ধরনের ভারী কাজ করতে পারবেন, নামাজ পড়তে পারবেন, স্বামী-স্ত্রী মেলা মেশা করতে পারবেন, মহিলারা সন্তান ধারন করতে পারবেন। আমরা এক মহিলা রোগী যার বাড়ী ব্রাহ্মনবাড়িয়া, বয়স ২৫ বছর, তার রেকটাম ক্যান্সার হওয়ায় অপারেশন করে তাকে ব্যাগ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এক বছর পর তিনি গর্ভবতী হন এবং সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তার এক ছেলে সন্তান হয়।

পেটে মলত্যাগের ব্যাগ লাগানোকে বলা হয় কলোষ্টমী বা আইলিওষ্টমী। বৃহদান্ত্র বা **Colon** কে যখন পেটের দেয়ালে লাগানো হয় তখন বলা হয় কলোষ্টমী **(Colostomy)**। এটি সাধারণত নাভীর বাম পাশে করা হয়। আইলিওষ্টমী **(Ileostomy)** বলা হয় তখন, যখন ক্ষুদ্রান্ত্রকে **(Small intestine/Ileum)** পেটের বাহিরে নিয়ে আসা হয়।

পেটে দুই ধরনের ব্যাগ লাগানো হয়।

(ক) স্থায়ী পদ্ধতিঃ যে ব্যাগ সারা জীবন রাখতে হবে;

(খ) অস্থায়ী পদ্ধতিঃ ব্যাগ লাগানোর পরে ২-৩ মাস পর আবার অপারেশন করে মলত্যাগের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর রোগী তার স্বাভাবিক পথে মলত্যাগ করতে পারে।

স্থায়ী কলোস্টমী বা আইলিওষ্টমী করা হয় তখন যখন মলদ্বার সম্পূর্ণ কেটে ফেলে দেয়া হয় অথবা খাদ্যনালীর নিচের অংশ কেটে ফেলে দিয়ে কোন কারণে মলদ্বারেরর সাথে জোড়া দেয়া যায় না। আর অস্থায়ী কলোষ্টমী

করার কারণ হচ্ছে যখন মলদ্বার বা রেকটামে অপারেশন করার পর ঐ পথে পায়খানা বের‍ুলে ইনফেকশন হবে এরূপ ভয় থাকে। এ কারণে পায়খানা বের‍ুবার জন্য পেটে স্বল্পকালীন বিকল্প পথ করে দেয়া হয়।

কলোষ্টমী কেন করা হয়ঃ

মলত্যাগের পথ অর্থাৎ পায়ুপথ (Rectum) ও মলদ্বার (Anus) যখন কোন রোগে নষ্ট হয়ে যায় তখন অপারেশন করে এই অংশটি কেটে ফেলে দিতে হয়। তাই খাদ্যনালীর অবশিষ্ট অংশকে পেটের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। যেখান থেকে পায়খানা বের হবে।

ব্যাগ লাগানোর নিয়ম কি?

কলোষ্টমীর স্থানটির পাশের (৭-৮ সে.মি. /৩ ইঞ্চি) বেশ কিছু জায়গা পানি বা স্পিরিট দিয়ে পরিস্কার করে শুকিয়ে ফেলতে হবে। চামড়ার উপর যেন কোনরূপ ময়লা না থাকে। এরপর যে অংশটি (Wafer) গায়ে লেগে থাকে সেটির মাঝখানের অংশটি কলোষ্টমীর আকৃতি অনুযায়ী কাটতে হবে। আটাল অংশের উপর একটি পাতলা কাগজ লাগানো থাকে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাঝখানে কাটা অংশের ভিতর দিকে চতুর্দিকে কলোষ্টমী পেষ্ট লাগাতে হবে। এরপর ওয়েফারটি পেটের সাথে লাগিয়ে এক মিনিট চেপে রাখতে হবে। কলোষ্টমী ব্যাগটি এবার ওয়েফারের সাথে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ব্যাগটি কখন কখন খুলে বাথরূমে পরিস্কার করে নিতে হবে। এই পূরো প্রক্রিয়াটি একজন কলোষ্টমী কেয়ার নার্স আপনাকে দেখিয়ে দিবেন। যাদের স্থায়ী কলোষ্টমী তাদের কখনও কোন সমস্যা দেখা দিলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। অনেকের বছরের পর বছর কোন সমস্যা হয় না।

রোগীদের ভুল ধারণাঃ

জনসাধারন মনে করেন ব্যাগ লাগানো হলে তিনি আর কোন কাজ করতে পারবেন না। রোগীদের জিজ্ঞাসা ব্যাগ লাগালে কয়দিন বাঁচব। আসলে ব্যাগ লাগানোর সাথে বাঁচা মরার কোন যোগাযোগ নেই। রোগীর মৃর্ত্যু হতে পারে ক্যান্সারের কারণে। ব্যাগ লাগালে স্বাভাবিক কাজ করতে পারবেন কিনা? সব ধরনের কাজ করতে পারবেন।

ব্যাগ লাগানো অবস্থায় নামাজ পড়ার উপায় কিঃ

নামাজ পড়ার পূর্বে ব্যাগ পরিস্কার করে নিতে হবে। এবং অজু করতে হবে। এরপর নামাজ পড়া অবস্থায় যদি ব্যাগে মল জমা হয় তাতে নামাজের কোন ক্ষতি হবে। এটি অভিজ্ঞ আলেমদের ফতোয়া।

স্বামী-স্ত্রীর সাথে মেলা মেশায় কোনরূপ নিষেধ নেই। সন্ড়ন ধারনেও কোন নিষেধ নেই। অপারেশনের পূর্বে সবাই খুব মন খারাপ করেন। এক থেকে দুই মাস পর রোগীদের যখন জিজ্ঞাসা করি আপনার কি কি অসুবিধা হয় তখন প্রায় সবাই বলেন তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

কিছু কিছু খাবার বেশী গ্যাস তৈরী করে এবং দুগন্ধ বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া উচিত নয়। যেমনঃ পিয়াজ, রসুন (অল্প খাবেন), ডিম, ফুল কপি, মূলা ইত্যাদি।
সারা পৃথিবীতে বহু লক্ষ রোগী আছেন যাদের পেটে ব্যাগ লাগানো হয়েছে। তারা সবাই মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। তবে আমার কথা এই যে এখন অত্যাধুনিক ষ্ট্যাপলিং পদ্ধতির কারনে খুব কম সংখ্যক রোগীর পেটে ব্যাগ লাগাতে হয়।

কলোষ্টমী পরিচর্যা - ইরিগেশন পদ্ধতি।

কলোস্টমী রোগীরা সাধারণ কলোষ্টমী ব্যাগ পেটের ওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখেন যার মধ্যে মাঝে মধ্যে পায়খানা ও গ্যাস জমা হয়। এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো দিনে ৩-৪ বার এটি পরিস্কার করতে হয়। আমাদের খাদ্যনালীর মল জমা থাকে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে খাদ্যনালী সয়ংক্রিয়ভাবে এগুলো বের করে দেয়। ইরিগেশন পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিয়মের উপায় নির্ভর করা হয় না। বিশেষ ধরনের একটি ব্যাগের ভিতর ২ লিটার সিদ্ধ পানি ভরে একটি পাইপের সাহায্যে কলোষ্টমীর মুখ দিয়ে খাদ্যনালীর ভিতর ঢুকাতে হয়। এতে পায়খানা নরম হয় এবং খাদ্যনালীর বিশেষ ধরনের Peristaltic Movement - এর মাধ্যমে ভিতরের পায়খানা বেরিয়ে আসে। এই কাজটি টয়লেটের ভিতর করতে হবে। পাইপের একটি অংশ "ড্রেইনেজ পাইপ" হিসাবে কাজ করে। যার মাধ্যমে পায়খানা পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং টয়লেটে চলে যাবে। এ কাজের জন্য একটি ব্যাগ ও একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র দরকার যাতে একটি ব্যাগ ও একটি পাইপ থাকে যার নাম ইরিগেশন সেট। একাজটি সমাধা করতে রোগীর ৩০-৪৫ মিনিট সময় লাগে। এরপর তিনি গোসল সেরে সকালে কাজে বের হবেন। এতে রোগীর আগামী ২৪ ঘন্টায় আর কোন পায়খানা বা বায়ু এপথে আর বের হবে না। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় জন্য রোগী টেনশনমুক্ত থাকতে পারে। এরপর কোন কলোষ্টমী ব্যাগ না লাগালেও রোগীর কোনরূপ অসুবিধা হবার কথা নয়। তবে কলোষ্টমীর মুখটি একটি প-াগ দিয়ে বন্ধ করা যায়। যাতে অনাকাংখিত কোন কিছু বেরিয়ে আসতে না পারে। এ পদ্ধতি যে রোগীরা ব্যবহার করছেন তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

মলদ্বার ও যৌন রোগ

হার্পিস প্রোকটাইটিস ঃ

ইহা একটি ভাইরাস জনিত রোগ। এতে মলদ্বারের ভিতরে ও রেকটামে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই রোগের উপসর্গসমূহ হল মলদ্বারে ব্যাথা, প্রদাহ, রক্ত পড়া বারবার মল ত্যাগের ইচ্ছা এমনকি ব্যাথার কারনে মল ত্যাগ করতে ভয় পাওয়া। এই রোগ সাধারণত পায়ুপথে সংগমের ফলে হয়, তবে যোনীদ্বার হতে ও এই রোগ মলদ্বারে ছড়াতে পারে। সাধারণত ঔষধের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সিফিলিস ঃ

পায়ুপথে সঙ্গমের ফলে পায়ুপথে ও সিফিলিস হতে পারে। প্রাইমারী সিফিলিস এর আলামত (কনডাইলোসেটা লেটা) পরবর্তীতে মলদ্বারের আশে পাশে দেখা যায়। পেনিসিলিন জাতীয় এন্টি বায়োটিক দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

গনোরিয়াঃ

এই রোগও পায়ুপথের সঙ্গমের ফলে হয়। এতে কোন প্রকার উপসর্গ নাও থাকতে পারে। তবে অনেক সময় মলত্যাগের সময় ব্যথা হয়। তাছাড়া মলত্যাগের সময় রক্তপড়া, রসপড়া, মলদ্বারের চামড়া ঝলসে যাওয়া, এবং ফিস্টুলা পর্যন্ড় হতে পারে।

পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ক্লেমাইডিয়াল প্রোকটাইটিস এবং লিসকোগ্রেনোলোসা ভেনেরাম -

এই রোগে পায়ুপথে ব্যাথা, রক্তপড়া এবং রস ঝড়া ইহাই সাধারণত উপসর্গ। মলদ্বারের পাশে ছোট ক্ষত হতে পারে এবং কুচকির গ- ন্ড ফুলে উঠা পরবর্তীতে রেকটাম প্রদাহ ও রক্তপড়া এবং এবং রেকটাম সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এই রোগ পায়ুপথে যৌন সংযমের ফলে ছড়ায়। তাছাড়া যোনীদ্বার হতেও ছড়াতে পারে। এই রোগের চিকিৎসার টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

কনডাইলোসেটা একুমিনাটাঃ

এই রোগ এক জাতীয় ভাইরাস (হিউমেন পেপিলেমা ভাইরাস টাইপ-৬ এবং ১১) দ্বারা হয়। ইহা একটি যৌন রোগ। মলদ্বারে সংগমের ফলে মলদ্বারের আশে পাশে এই রোগ দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এইডস্ এ আক্রান্ড় রোগীর মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভব বেশী দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এই রোগের প্রার্দুভাব অনেক বেড়ে যায়।

উপসর্গঃ

মলদ্বারের চারিপাশে মাংস পিন্ড বেড়ে যাওয়া, চুলকানি, রসঝড়া, রক্তপড়া, দুর্গন্ধ, ব্যাথা ইত্যাদি। দেখতে অনেকটা ফুলকপির মতো মাংসের থোকা মলদ্বারের চারিপাশে দেখা যায়।

জটিলতা ঃ

এই রোগ হতে পরবর্তীতে মলদ্বারে ক্যান্সার হতে পারে।

চিকিৎসাঃ

বিভিন্ন ঔষধের দ্বারা এই চিকিৎসা করা যায়। ইলেকট্রোকটারীও করা যায়। লেজার থেরাপীর মাধ্যমেও এর চিকিৎসা করা যায়।

এনাল ইনকনটিনেন্স (Anal incontinence; মল বা বায়ু ধরে রাখতে না পারা)

কারণ সমূহ ঃ

- অতি বৃদ্ধ;
- রেকটাল প্রোলাপস ও পাইলসের সাথে সম্পৃক্ত;
- অপারেশনের কারনে এবং
- বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুঘটিত রোগের কারনে।

উপসর্গঃ

বায়ু, তরল মল বা কঠিন মল ধরে না রাখতে পারা। হাঁচি-কাসি বা এমনি এমনি মল বা বায়ু ধরে রাখতে না পারা। অতি অল্প ইনকন্টিনেন্স বায়ু ধরে রাখতে পারে না। আর যখন শক্ত মল ও ধরে রাখতে পারে না একে বলে টোটাল ইনকন্টিনেন্স। ইহা একটি অতি বিব্রতকর পরিস্থিতি।

চিকিৎসাঃ

খুব কম ইনকনটিনেন্স বা বায়ু ধরে রাখতে না পারলে বিভিন্ন ব্যায়াম (পেরিনিয়াল এক্সারসাইজ) দেয়া যেতে পারে। নিউরোলজিকাল কোনো সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা যেতে পারে। রেকটাল প্রোলাপস বা পাইলস থাকলে তার চিকিৎসা কারা যেতে পারে। আর সার্জারীর কারনে স্ফিংটার কেটে গেলে তা আবার জোড়া লাগানো (এনাল স্ফিংটার পার্স্টি) যেতে পারে।

মলদ্বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- প্রোকটোস্কপিঃ

চোঙ্গের মতো একটি যন্ত্র দিয়ে মলদ্বারের ভিতরে দেখা হয়। রেকটামের নিচের অংশ পর্যন্ড় দেখা যায়। এর মাধ্যমে রেকটাম এর নিচের অংশ এবং মলদ্বার খুব ভাল করে দেখা যায়। কোন টিউমার থাকলে বায়োপসি করে নেয়া সম্ভব হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পাইলস খুব ভাল ভাবে বুঝা যায়।

- সিগময়োডোস্কপিঃ

এর মাধ্যমে মলদ্বার রেকটাম সিগময়োডকোলন পর্যন্ড় দেখা যায়। ইহা দুই ধরনের একটি রিজিড বা শক্ত এবং একটি ফ্লেক্সিবল বা নরম। রিজিড এর মাধ্যমে ৩০ সেঃ মিঃ পর্যন্ড় দেখা সম্ভব হয়। আর ফ্লেক্সিবল এর মাধ্যমে ৬০সেঃ মিঃ পর্যন্ড় দেখা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে আমরা বায়োপসিও নিতে পারি।

- কোলনস্কপিঃ

এই যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ন কোলন এমনকি কিছুটা আইলিয়াম পর্যন্ড় দেখতে পারি এবং বায়োপসি পর্যন্ড় নিতে পারি। কোলনে কোন ক্যান্সার থাকলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষার জন্য রোগীর কোলন পরস্কিার করতে হয়। ফলে এই পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নিতে হয়। ৪০-৫০ বছর বয়সে সবাইকে অন্ড়ত একবার কোলনস্কোপি করা উচিত।

পাইলস চিকিৎসা নিয়ে প্রতারনা

পাইলস রোগটি সর্ব সাধারনের নিকট অর্শ বা অরিশ হিসাবে পরিচিত । চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি piles বা Hemorrhoids. এরোগে মলদ্বার থেকে মাঝে মধ্যে রক্ত যায় । কখনো বেশি কখনো কম। মলত্যাগের সময় অনেকের মলদ্বার ফুলে ওঠে আবার কারো কারো মাংশ পিন্ড ঝুলে পড়ে যা আবার আপনা আপনি ভিতরে ঢুকে যায় অথবা চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে এর চিকিৎসা ও প্রতিকার কি? যুগ যুগ ধরে এজাতীয় রোগীরা প্রতারনার শিকার হয়ে আসছেন। অনেক হাতুরে চিকিৎসক আছেন যারা বিনা অপারেশনে চিকিৎসার নামে জনগনকে বিভ্রান্ড় করছেন । তারা অনেকে মলদ্বারে বিশাক্ত কেমিকেল ইনজেকশন দিচ্ছেন যাতে মলদ্বারে মারাত্মক ব্যথা হয় এবং মলদ্বারের আশে পাশে পচন ধরে এবং এজন্য রোগী অবর্ননীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন। পরিনামে কারো কারো মলদ্বার সর্ু হয় এবং বন্ধ হয়ে যায় । তখন পেটে মলত্যাগের বিকল্প পথ করে দিয়ে ব্যাগ লাগিয়ে দিতে হয়। আবার কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক বিষাক্ত কেমিকেল পাউডার দেন যা মলদ্বারে লাগালেও মলদ্বার পচে ঘা হয়ে যায় এবং রোগীর একই পরিনতি হয়। রোগীরা যখন বিনা অপারেশনের কথা শোনেন তখন এজাতীয় চিকিৎসার জন্য খুবই প্রলুব্ধ হন। তিনি যখন প্রতারনার শিকার হন তখন আর তার কিছুই করার থাকে না।

ইদানিংকালে আমরা পত্রিকায় দেখতে পাই যে লেজার সার্জারীর মাধ্যমে ধনন্ড়্রী পাইলস চিকিৎসা হচ্ছে। বিশয়টি মোটেই সত্য নয়। কারন এটি আন্ড়র্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে লেজারের মাধ্যমে পাইলস চিকিৎসায় কোন অতিরিক্ত সুবিধা নেই। আমরা বহুবার পত্রিকায় এবং টেলিভিশনে বলেছি যে রিং লাইগেশন এবং লংগো অপারেশনের মাধ্যমে প্রায় ১০০% রোগীর মলদ্বারে কোন র্প কাটা ছেড়া ছাড়া চিকিৎসা করা সম্ভব। এবং আমরা তা বাস্ড়বে করেছি বিগত ১০ বৎসর যাবৎ।

প্রচলিত অপারেশনে মলদ্বারের তিনটি মাংশ পিন্ড কাটতে হয়। যা আজকাল আমরা শুধু তাদের জন্যই করি যারা রিং লাইগেশন এর জন্য উপযুক্ত নয় এবং লংগো অপারেশন এর যন্ত্র কিনতে অক্ষম। লেজার দিয়ে পাইলস অপারেশন প্রচলিত অপারেশনের মতই। পার্থক্য শূধু এতটুকু যে এক্ষেত্রে লেজার বিম দিয়ে কাটা হয়

এবং প্রচলিত অপারেশনে সার্জিক্যাল নাইফ দিয়ে কাটা হয় । প্রচলিত অপারেশনের ন্যায় লেজার অপারেশনেও তিনটি ক্ষত স্থান হবে । লেজার অপারেশনের পর সাধারন অপারেশনের মতই ব্যথা হয় ঘা শুকাতে ১-২ মাস সময় লাগে। এবং প্রচলিত অপারেশনের মতই একই ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে । কোন কোন বিশেষজ্ঞ লেজার অপারেশনের পর কিছুটা কম ব্যথা হয় বলে দাবি করেছেন। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের নিকট এটি তেমন তাৎপর্যপূর্ন বলে মনে হয় নি। ইংল্যান্ডের অত্যান্ড় খ্যাতনামা সার্জন অধ্যাপক ডাঃ নিকলস এর মতে লেজার সার্জারীতে কোন অতিরিক্ত সুবিধা নেই।

বরঞ্চ এতে অত্যন্ড় ব্যয় বহুল যন্ত্র এবং বিশেষ প্রশিক্ষনের দরকার হয়।এছাড়া নিরাপত্তার জন্য চোখে গগলস পরতে হয়। চিকিৎসা ব্যয়ও বেশী। পাইলস চিকিৎসার জন্য বহু ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ইনজেকশন ,রিংলাইগেশন, ইলেকট্রোকোয়াগুলেশন,, আলট্রযেড, ক্রায়োথেরাপি ইনক্রারেড ফটোকোয়াগুলেশন ,এনাল ডাইলেটেশন, লেজার থেরাপী, প্রচলিত অপারেশন এবং লংগো অপারেশন। সবধরনের পদ্ধতির মেরিট এবং ডিমেরিট বিবেচনা করলে এবং বর্তমানে বিশ্বব্যপী সার্জনদের প্রাকটিস বিবেচনা করলে তিনটি পদ্বতি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত আর তা হচ্ছে রিংলাইগেশন, লংগো অপারেশন, ও প্রচলিত অপারেশন।

এতকিছু বিবেচনা করলে এটি নির্দিধায় বলা যায় যে পত্রিকায় লেজার সার্জারীর বিজ্ঞাপন একটি অহেতুক , গনবিরোধী এবং চটকদার রোগী ভিড় করানো বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারন রিংলাইগেশন ও লংগো অপারেশনে মলদ্বারে কোনরূপ কাটা ছেড়া ছাড়াই ৯০-৯৫% রোগীর পাইলস রোগের সমাধান সম্ভব। এবং তা দেশেই আমরা করছি দশ বছর যাবত।

বিভিন্ন ধরনের এক্সরে

- বেরিয়াম এনেমাঃ এর মাধ্যমে কোলনের বিভিন্ন রোগ এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ড় মোটামুটি ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এতে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় নেয়া সম্ভব হয়না। ধারনা করা চলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে টিউমারের অবস্থান নির্ণয় সম্ভব।
- ডাবল কনট্রাস্ট বেরিয়াম এনেমা ঃ

এর মাধ্যমে কোলন এবং রেকটাম আরও ভালভাবে দেখা যায় এবং এই পরীক্ষা বেরিয়াম এনেমার চেয়ে ভাল।

- সিটি স্কেনঃ

এর মাধ্যমে রেকটাম ও কোলনের ক্যান্সারের বিস্ড়তি খুব ভালভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে কিনা তাও ভালভাবে বুঝা যায়।

- এম আর আই ঃ

এর মাধ্যমেও ক্যান্সারের বিস্ড়তি বুঝা যায়। ইহা ব্যয়বহুল পরীক্ষা। তবে এর মাধ্যমে ছিড়ে যাওয়া মলদ্বারের মাংসপেশী খুব ভাল বুঝা যায়।

পাইলস, ফিস্টুলা, এনাল ফিশার ও ক্যান্সার চিকিৎসায় সফলতা

পাইলস, ফিস্টুলা, পায়ুপথে রক্তক্ষরনসহ পায়ুপথের নানাবিধ জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা হাতুড়ে ডাক্তার কর্তৃক অপচিকিৎসার স্বীকার হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীরা যে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন না তা নয়। তবে এদের সংখ্যা নিতান্ড়ই অপ্রতুল। এর একটা কারণ অবশ্যই আছে আর তা হচ্ছে গোপন এ স্থানের সমস্যার কথা রোগীরা প্রকাশ করতে চান না। বিশেষ করে মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি আরও বেশী। তবে আশারকথা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাইলস, ফিস্টুলা, রেকটাল ক্যান্সার এসবের চিকিৎসা ও অপারেশনের ক্ষেত্রে এক বিপ-ব সৃষ্টি করেছেন এ দেশের সার্জন লেখক নিজেই। তিনি ১৯৯৪ সালে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ল্যাপরোস্কপি সার্জারীর উপর এবং পরে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে হেপাটোবিলিয়ারী ও কলোরেকটাল সার্জারি বিভাগে এক বছর রেজিষ্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো তিনি বাংলাদেশে ক্যারিয়ার করতে চেয়েছিলেন ল্যাপরোস্কপি সার্জারীর ওপর অর্থাৎ পেট না কেটে গলব-াডারের পাথর অপসারণ করতে চান তিনি। বাংলাদেশে অবশ্য গলব-াডার-এর পাথরের রোগীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। সম্ভবতঃ আত্মীয়তা অথবা পরিচয় সূত্রে তিনি দেখা করলেন ইত্তেফাকের জেনারেল ম্যানেজার এককালের বিশিষ্ট সাংবাদিক খন্দকার শাহাদাৎ হোসেনের সাথে। তিনি লেখককে পাঠালেন আমার কাছে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য পাতায় লেখা-লেখি করবেন। লেখকের ইচ্ছা হলো তিনি সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ল্যাপরোস্কপি সার্জারীর ওপর। প্রতিষ্ঠা পেতে চান ল্যাপরোস্কপি সার্জন হিসেবে। আমি তার কাছে বিস্ড়ারিত জেনে তাকে ল্যাপরোস্কপিক সার্জন হিসেবে ক্যারিয়ার করতে নির"ৎসাহিত করি। কারণ সে সময় বাংলাদেশে ল্যাপরোস্কপিক সার্জারীর ক্ষেত্রে নতুন বিপ-ব সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বিপ-বের পিছনেও রয়েছে ইত্তেফাকের অপরিমেয় অবদান। কারণ এ দেশে ল্যাপরোস্কপি সার্জারীকে জনপ্রিয় করতে সদ্য পি.এইচ.ডি করে জাপান হতে দেশে ফেরা ডাঃ সরদার এ নাঈমকে উৎসাহিত করে ইত্তেফাকই সর্বপ্রথম এ দেশে ল্যাপরোস্কপি সার্জারীর প্রসারে অবদান রাখে। এর পূর্বে প্রতি বছর হাজার হাজার রোগী গলব-াডারের পাথর ও অন্যান্য সমস্যাজনিত রোগী ভারতসহ বিদেশে যেতো। ডাঃ নাঈমের পথ ধরে এ দেশে তৈরী হয়েছে এ পর্যন্ড় শতাধিক ল্যাপরোস্কপিক সার্জন। আজ আর গলব-াডারের পাথর অপারেশনে রোগীরা বিদেশে যায় না। যাহোক লেখক যেহেতু ইত্তেফাকের মহা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন সে কারণে ল্যাপরোস্কপিক সার্জারীর বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম। বরং লেখকের কথামত জানতে পারলাম তিনি সিঙ্গাপুরে শুধু ল্যাপরোস্কপি সার্জারীর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাই নয়, তিনি পাইলস, ফিষ্টুলার ওপরও বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং অপারেশন ছাড়াই পাইলসের চিকিৎসা করা যায় এমন একটি ধারণা দিলেন। আমি আর কালবিলম্ব না করে তাকে পাইলস, ফিস্টুলাসহ পায়ুপথের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ক্যারিয়ার

করতে পরামর্শ দিলাম এবং তিনি প্রথমতঃ রাজি ছিলেন না তথাপি টেষ্ট কেস হিসেবে আমার কথামত পাইলস, ফিস্টুলা-এর ওপর ইত্তেফাকের স্বাস্থ্য পাতায় কয়েকটি লেখা দিলেন। কিন্তু রোগীরা বেশ খানিকটা সাড়া দিলো। যারা দীর্ঘদিন ধরে পাইলস, ফিস্টুলার রোগে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন তারা স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেললেন। লেখক সার্জনের চেম্বারে রোগীদের ভীড় পড়তে থাকলো। পাইলস, ফিস্টুলা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি সার্জন। স্বীকৃতি মিললো আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় কলো-রেকটাল সার্জনগণ তাকে বিশ্বের ব্যস্ড়তম 'পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তিনি সম্প্রতি বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারীতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের বিরল সম্মানজনক 'ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশীপ' অর্জন করেন। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব কোলন এন্ড রেকটাল সার্জনস' একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে এই স্কলারশীপ প্রদান করে। এ বছর বাংলাদেশের কলোরেকটাল সার্জন এই লেখক এ সম্মান অর্জন করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ সার্জনের এ কৃতিত্ব চিকিৎসক মহলেও আলোচিত হয়েছে। তিনি উক্ত স্কলারশীপের সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব কোলন এন্ড রেকটাল সার্জনস-এর বার্ষিক আন্ড়র্জাতিক সম্মেলনে 'অপারেশন সত্ত্বেও বার বার ফিষ্টুলা হওয়া কি রোগটির ধর্ম? নাকি পূর্ববর্তী অপারেশনের ত্র"টি' শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিশ্বের ৪৬টি দেশের ১ হাজার ৬৩২ জন সার্জন তার নিবন্ধ শোনেন এবং তার তথ্য ও উপস্থাপনা প্রশংসিত হয় বলে তিনি জানান এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকার কিছু কাটিং দেখান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত ৩টি হাসপাতাল, লাহি ক্লিনিক, ক্লেভল্যান্ড ক্লিনিক ও মায়ো ক্লিনিকে তিন সপ্তাহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তার বিষয় বস্তুর ওপর বক্তব্য রাখেন। মায়ো ক্লিনিকের অধ্যাপক বিশ্বের স্বনামধন্য সার্জন সানহাত নিভা টভৎস ও অধ্যাপক রজার ডোজয়েস এবং অন্যান্য ক্লিনিক ও হাসপাতাল হতে লেখককে যে সমস্ড় সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে তাতে কালো-রেকটাল সার্জারীর ক্ষেত্রে তার দক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া আমেরিকান সোসাইটি অব কোলন এন্ড রেকটাল সার্জনস এ বছর বিশ্বের ৬টি দেশের ৪৬ জন সার্জনকে আন্ড়র্জাতিক ফ্যাকালটি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশের এই লেখক সার্জনের নাম অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত সোসাইটির ফ্যাকালটিভুক্ত অপর ৫টি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল ও সুইডেন।

একথা বলার অবকাশ নেই যে, লেখক দেশের একমাত্র কলো-রেকটাল সার্জন। দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কলো-রেকটাল সার্জন রয়েছেন। তবে এ কথাও সত্য যে, লেখক পাইলস-ফিষ্টুলা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সুনাম অর্জন করেছেন এবং নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন।

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস
বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ
ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারী (সিংগাপুর)
ইন্টারন্যাশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারী (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান(অবঃ), কলোরেকটাল সার্জারী বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বারঃ ইডেন মাল্টি-কেয়ার হসপিটাল
৭৫৩, সাত মসজিদ রোড (স্টার কাবাব সংলগ্ন) ধানম"ি, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭২৬৭০৩১১৬, ০১৭১৫০৮৭৬৬১, ।

অসম্পূর্ন মলত্যাগ বা বাধাগ্রস্থ মলত্যাগ

Obstructed defecation syndrom

আমরা যদি সাধারন খাবার খাই যাতে সব্জি ফলমূল মাছ মাংশ সব ধরনের খাবার থাকে তাহলে একজন সুস্থ লোক সাধারন দিনে ১-২ বার থেকে সপ্তাহে ২-৩ বার মলত্যাগ করে থাকেন। আমাদের দৈনন্দিন খাবার তালিকায় মাছ মাংশ ছাড়াও আঁশ জাতীয় খাবার যথা শব্জি, ফলমূল ও পানীয় থাকা অত্যাবশ্যক।

মলত্যাগের বেগ হলে আমরা সাধারনত টয়লেটে যাই এবং মলত্যাগ করি। পায়খানা করার পর আমাদের সবারই একটা স্বস্ড়িদায়ক অনুভূতি হয় (sense of satisfaction of complete evacuation)। কিন্তু যখন পায়খানা শক্ত হয়, বেশি কোথ দিয়ে পায়খানা বের করতে হয় অথবা মলদ্বারে ব্যথা হয় তখন সবারই কষ্ট লাগে।

কিছু কিছু লোক আছেন যাদের পায়খানা ক্লিয়ার হয় না, অনেকক্ষন ধরে বাথর"মে বসে থেকেও পায়খানা সম্পূর্ন হয় না, ছেড়া ছেড়া পায়খানা (Fragmented stool) হয় অর্থাৎ একটু পায়খানা হয় তারপর অনেকক্ষন চেষ্টা করার পর আবার একটু হয়। এরপরও মনে হয় পায়খানা ভিতরে রয়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকেই মলদ্বারের পাশে চাপ দিয়ে, মলদ্বারের দুইপাশে টানদিয়ে পায়খানা করেন। অনেকে এভাবেও পায়খানা ক্লিয়ার হয়নি বলে পায়খানার রাস্ড়ার ভিতর আংগুল দিয়ে পায়খানা বের করেন। অনেকে বাচ্চা হওযার রাস্ড়ায় (Vagina) আংগুল দিয়ে চাপ দিলে পায়খানা ক্লিয়ার হয়।

এ জাতীয় রোগীদের অনেকে জুলাপের ঔষধ অর্থাৎ মল নরম করার ঔষধ যেমন Regulose, Avolac, Xylose, Duralax ইত্যাদি খেয়ে অভ্যস্ড় হয়ে গিয়েছেন। বহু রোগী পায়খানা ক্লিয়ার না হওয়ায় অফিসে যেতে দেরি করেন। অনেকে দৈনিক পত্রিকা বা গল্পের বই বাথর"মে রেখে দেন কারন তাদের দীর্ঘ সময় টয়লেটে বসে থাকতে হয়। অনেক রোগী টয়লেট করার কিছুক্ষন পর অনুভব করেন যে টয়লেট ক্লিয়ার হয়নি তাই কিছুক্ষন পরপর আবার বাথর"মে যান। এই সব রোগীদের মাঝে মধ্যে পায়খানার সাথে রক্ত যায় এবং পায়খানার রাস্ড়ায় ব্যথা অথবা অস্বস্ড়ি (Discomfort)হয়। এ রোগে মহিলা ও পুর"ষ উভয়েই ভোগেন। তবে মহিলা রোগীর সংখ্যা বেশী। বিশেষ করে যাদের সন্ড়ান সংখ্যা বেশী, যে মহিলাদের কোনও সন্ড়ান

নেই তাদেরও এই রোগ হয়। এদের মূল উপসর্গ হল তারা পায়খানার বেগ স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করেন কিন্তু পায়খানা ক্লিয়ারভাবে করতে পারেন না।

এ রোগ হলে Colonoscopy পরীক্ষা এবং Magnetic resource defecogram করতে হয়।

এ রোগের প্রধান কারন পায়ুপথ (Rectum) এর গঠনগত অস্বাভাবিকত্ব বা Structural abnormality. এ ক্ষেত্রে পায়ুপথের ওয়াল ঝুলে পড়ে. পায়খানা চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে. মহিলাদের ক্ষেত্রে পায়খানার রাস্ড়ার (Rectum) সাথেই বাচ্চাহওয়ার রাস্ড়া (vagina) থাকে. এক্ষেত্রে পায়খানার রাস্ড়ার একটি অংশ (vagina) এর ভিতর ঢুকে যায়.তখন যৌন পথের ভিতর আংগুল চাপ দিলে মলত্যাগ সহজ হয়।

চিকিৎসার জন্য রোগিদের মল নরম করার ঔষধ খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয় এতে যদি কাজ না হয় তা হলে অপারেশান করা প্রয়োজন হয় । এ অপারেশানের নাম STARR (Stapled Trans anal rectal resection) ।অপারেশানটি কয়েক বৎসর আগে ইটালিয়ান সার্জন প্রফেসর এন্টনিও লংগ আবিষ্কার করেন। যিনি পাইলসের জন্য (Longo) অপারেশান আবিস্কার করে বিশ্বব্যপি পরিচিতি পেয়েছেন।

STARR অপারেশনে পেট কাটার প্রয়োজন হয় না । অপারেশানটি মলদ্বারের ভিতর দিয়ে করতে হয় । এজন্য দুটি (Stapling instrument) ব্যবহার করতে হয় এ অপারেশানে পায়ুপথের ভিতরে যেখানে মলআটকে থাকে সেই মাংশটুকু কেটে ফেলতে হয়। এ অপারেশান বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম আমি করি ২০১৩ সালে। ইতিমধ্যে অনেক গুলো অপারেশান করেছি বেশিরভাগ অপারেশানে রোগিরা উপকার পেয়েছেন। প্রথম যে মহিলাকে অপারেশান করেছি তিনি বলেছেন ৮০% উপকার পেয়েছেন। একজন পুর"ষ রোগি যার বয়েস ৪৬ বৎসর তিনি বলেছেন যে এই অপারেশানের পর তিনি প্রস্রাব ও ভালভাবে করতে পারছেন । তিনি অত্যান্ড় আনন্দের সাথে বলেছেন যে স্যার আমি ১২ বৎসর বয়সে যে ভাবে আরামে পায়খানা করতাম এখন সেভাবে আরাম বোধ করছি।

এই অপারেশন কার জন্য প্রযোয্য এটি খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। অপারেশান প্রক্রিয়াটি জটিল । খুবই অভিজ্ঞ (Colorectal Surgeon) দের করা উচিৎ । তলপেটে সংক্রমন (Infection), প্রচুর রক্তক্ষরন জাতিয় জটিলতা হতে পারে। আমি তিন বৎসর যাবৎ যাদের অপারেশান করেছি তাদের কারো জটিলতা হয়নি প্রতিটি রোগী কমবেশি উপকার পেয়েছেন।

অসংখ্য রোগী এই সমস্যায় ভুগছেন । কিন্তু রোগীরা ডাক্তার ছাড়া কাউকে এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। কারন বিষয়টি ব্যক্তিগত এবং বিব্রতকর যার জন্য সমাজ এ বিষয়টি এতটা জানেনা এবং গুর"ত্বের সাথে দেখেনা ।

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস

বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ
ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারী (সিংগাপুর)
ইন্টারন্যাশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারী (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান(অবঃ), কলোরেকটাল সার্জারী বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বারঃ ইডেন মাল্টি-কেয়ার হসপিটাল
৭৫৩, সাত মসজিদ রোড (স্টার কাবাব সংলগ্ন) ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭২৬৭০৩১১৬, ০১৭১৫০৮৭৬৬১, ।

কোলনস্কপি (Colonoscopy)

কোলনস্কপি পায়ুপথ, রেকটাম ও কোলন বা বৃহদন্ত্রের একটি পরীক্ষা বা Test. এটির প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ১৯৭০ সনে। এ পরীক্ষাটি পায়ুপথ ও কোলনের রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। খাদ্যনালী আমাদের মুখ থেকে শুরু হয়ে পেটের ভিতর দিয়ে পায়খানার রাস্তায় শেষ হয়, খাদ্যনালীর শেষের পাঁচ ফুটকে বলা হয় কোলন, রেকটাম (পায়ুপথ) ও এনাস (মলদ্বার)। খাদ্যনালীর এই অংশটিতে পায়খানা জমা থাকে।

কোলনস্কপিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি। শর্ট কোলনস্কপি ও ফুল কোলনস্কপি। কোলনের নীচের দিকে ক্যান্সার সহ বেশীর ভাগ রোগ হয় তাই আমরা রুটিন ভাবে সবারই শর্ট কোলনস্কপির উপদেশ দেই। রোগীর কথাবার্তায় এবং উপসর্গে যদি সন্দেহ হয় তখনই আমরা ফুল কোলনস্কপি করি। বয়স যখন পঞ্চাশের উপর হয় অথবা নিকটাত্মীয়ের কোলন ও রেকটাম ক্যান্সার থাকে তখন অল্প বয়সেও ফুল কোলনস্কপির উপদেশ দেয়া হয়।

কোলনস্কপি কখন করতে হয়?

রোগী যখন পায়খানার রাস্তায় কোন সমস্যায় ভোগেন যেমন, মলদ্বারে ব্যাথা, ফুলা, পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া, পায়খানা ঘন ঘন হওয়া, পায়খানা ক্লিয়ার না হওয়া, পেটে ব্যাথা, পেট ফোলা পায়খানার সাথে আম বা মিউকাস যাওয়া। যাদের বর্তমানে কোন সমস্যা নেই তাদের মধ্যে কারো কারো কোলনস্কপি করতে হয়। যেমন যাদের বয়স পঞ্চাশের উপর অথবা যাদের নিকটাত্মীয়ের কোলন ক্যান্সার হয়েছে। এছাড়া আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ক্রনস ডিজিজে রোগের উন্নতি বা ফলো আপের জন্য বা যাদের ক্যান্সার অপারেশন হয়ে গিয়েছে তাদের পরবর্তী ফলো আপের জন্য।

যে রোগীদের পায়খানার সাথে রক্ত যায় তাদের আমরা যখন কোলনস্কপি করতে বলি তখন তারা বলেন স্যার, আপাতত কিছু ঔষধ দেন তাতে যদি ভাল না হই তখন কোলনস্কপি করব। সম্মানিত রোগীদের অবগতির জন্য

জানাচ্ছি যে, পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়ার কারণ গুলো হল, পাইলস, ফিস্টুলা, এনাল ফিসার, ক্যান্সার, আলসারেটিভ কোলাইটিস, পলিপ, যক্ষা, কোলাইটিস সহ আরো অনেক রোগ। এরোগ গুলোর একেকটার একেক ধরনের চিকিৎসা। মলদ্বারের ভিতর পরীক্ষা করে নিশ্চিত না হয়ে আমি কোন রোগের চিকিৎসা দেব। আমাদের কাছে অনেক রোগী আসেন যাদের পাইলস অপারেশন হয়েছে। রোগীরা বলেছেন স্যার অমুক হাসপাতালে পাইলসের অপারেশন করেছি কিন্তু এখনও আমার রক্ত যাচ্ছে। তখন আমরা কোলনস্কপি পরীক্ষা করে, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ক্যান্সার বা পলিপ পাই। আসলে এটিই তার রক্ত যাওয়ার কারণ ছিল কিন্তু পাইলস যেহেতু কমন রোগ অতএব পাইলস মনে করে কোন রুপ কোলনস্কপি না করে এই অপারেশন করাই ব্যর্থতার কারণ।

কোলনস্কপির প্রস্তুতি (Bowel Preparation)

কোলনের ভিতর সব সময় পায়খানা ভর্তি থাকে, এমনকি যাদের নিয়মিত পায়খানা হয় তাদেরও। পেটে যত পায়খানা জমা থাকে তার একটি অংশ মাত্র বেরিয়ে আসে। কোলনের ভিতর পায়খানা থাকলে আসল রোগ চোখে দেখা যাবে না। অতএব একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেটের সব পায়খানা বের করে দেওয়াকে বলে Bowel Preparation (বৃহদন্ত্রকে পরীক্ষার উপযোগী করা)। সাধারণ ভাবে পরীক্ষার আগের দিন দুপুরে Low residue diet অর্থাৎ আশ জাতীয় ও শব্জী/ ফলমূল বিহীন হালকা খাবার খেতে হবে। এরপর বিকেল থেকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খেতে হবে যার ফলে অনেকবার পাতলা পায়খানা হয়ে শেষ পর্যন্ত পানির মত পায়খানা হলে বুঝতে হবে প্রস্তুতি সঠিক হয়েছে। এজন্য রোগীকে একটি ছাপানো কাগজ দেয়া হয় যাতে সমগ্র প্রক্রিয়াটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লেখা থাকে। এ প্রস্তুতিতে বৃদ্ধ, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রস্তুতির ঔষধ খাবার পর শুধু মাত্র ক্লিয়ার (ঘোলাটে নয়) খাবার ও পানি বা ওরসালাইন খাওয়া যাবে। অন্য কোন ধরনের খাবার সম্পূর্ণ রুপে নিষেধ। পরীক্ষা শেষে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম মাইলো/হরলিকস্ জাতীয় খাবার এবং তারপর স্বাভাবিক খাবার খাওয়া যাবে।

Test বা কোলকস্কপি পরীক্ষা ভীতি:

এই পরীক্ষার কথা শুনলে রোগী একটু ভয় পান। কিন্তু আধুনিক যুগে ভয় পাবার কোনই কারন নেই্ এ পরীক্ষা করার আগে আমরা তাকে বিভিন্ন ইনজেকশন দেই যাতে রোগীর ব্যথা না হয় এবং রোগী ঘুমিয়ে থাকেন। এখন এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে Test করার পর রোগী যখন সজাগ হন তখন তিনি এসে তাড়া দেন কই আমার টেস্ট করা হচ্ছে না কেন? ঔষধের কারণে রোগী মনেই করতে পারে না যে তার টেস্ট হয়ে গিয়েছে।

কোলনস্কপি পরীক্ষায় রোগীর কি উপকার হয়?

কোলন ক্যান্সার রোগটি বংশগত এবং বংশগত ছাড়াও হয়। মা, বাবা বা ভাই-বোনের যখন ক্যান্সার হয় তখন আমরা পরিবারের সবার কোলনস্কপির উপদেশ দেই। যদি এদের মধ্যে কারো পলিপ পাওয়া যায় তাহলে কোলনস্কপির মাধ্যমে সেটি অপারেশন করে ফেলে দেয়া যায় এবং মাংশ পরীক্ষা করে দেখা যায় তার ভিতর ক্যান্সার আছে কিনা। এভাবে একটি মানসিক উৎকণ্ঠার নিরসন সম্ভব।

পৃথিবীর সমস্ত কলোরেকটাল সার্জনগন এব্যাপারে একমত যে মলদ্বার বা পায়ুপথে কোন সমস্যা হলে কোলনস্কপি পরীক্ষা ম্যান্ডেটরী বা অবশ্য করনীয়। অনেক রোগী মনে করেন যে আমার সমস্যা অতি সাধারণ আমি কেন কোলনস্কপি করব। বিগত বিশ বৎসরে আমি প্রায় দুই লক্ষ রোগীর পায়ুপথের চিকিৎসা করেছি। আমার জীবনে অসংখ্য ঘটনা আছে যা বলতে পারব। একটি ঘটনা দুই বৎসর আগের। চট্টগ্রামের একজন পুরুষ রোগী এলেন যার বয়স ৬৬। ওনার মলদ্বারে সাধারণ একটি ফিস্টুলা পেলাম। রোগীর ও তেমন কষ্ট কিছু নয়। আমি তাকে বললাম যে আপনার সাধারণ একটি ফিস্টুলা আছে মলদ্বারে। আপনার কোলনস্কপি পরীক্ষা করতে হবে। রোগী বললেন আমার মলদ্বারে সামান্য সমস্যা ছাড়া পেটে কোন সমস্যা নেই। আমি তখন রোগীকে বললাম যে আপনার কোন সমস্যা নেই আমি জানি। এটি রুটিন ভাবে আমরা সবার করি। আপনার যেদিন পেটে ব্যাথা হবে এবং পেট ফুলে উঠবে সেদিন পরীক্ষা করে লাভ হবে না। তখন রোগী বললেন আমি বিগত পঞ্চাশ বৎসর কোন ডাক্তারের কাছে যাইনি এবং একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ও খাইনি। কি জন্য এই পরীক্ষা করব। আমি বললাম কিছু হয়নি এজন্যই এই পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আপনার কোলনে সুপ্ত কোন সমস্যা আছে কি না তা আমরা ধরতে পারব। আর যদি কোন রোগ না পাওয়া যায় তাহলে আপনি নিশ্চিত হলেন যে আপনার কোলন ভাল আছে। মনে হল রোগী বেশ বিরক্ত হলেন। তিনি চলে গেলেন। আমিও নিজের উপর বিরক্ত হলাম। কেন একজন সুস্থ রোগীকে কোনরূপ উপসর্গ না থাকা সত্ত্বেও কোলনস্কপি করতে বললাম।

রোগী কিছুটা বিরক্ত এবং অখুশী হয়ে গেলেন। দশদিন পর হঠাৎ সেই রোগীকে আবার দেখলাম তিনি পরীক্ষা করার জন্য এসেছেন। পরীক্ষা করার সময় আমার মন খারাপ অহেতুক একজন লোককে কলোরেকটাল সার্জারীর নীতি (Principles of colorectal surgery) প্রয়োগের কারনে কষ্ট দেয়ার জন্য। টেস্ট করার সময় আমি দেখতে পাই তার কোলনে (মলদ্বারের ৬০ সেন্টিমিটার বা দুই ফুট গভীরে) একটি ক্যান্সার। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কয়েকবার কোলনস্কপি ভিতরে ঢুকাচ্ছি বাহির করছি যে আমি সঠিক দেখছি কিনা। সেখান থেকে Biopsy তে (মাংশ পরীক্ষা) প্রমানিত হলো যে তার নিশ্চিত কোলন ক্যান্সার। উনার তিন ছেলে বিদেশে থাকেন সবাই তাকে বিদেশে নিতে চায়। কিন্তু তিনি কোনমতেই রাজী হলেন না।

পরবর্তীতে আমরা তার অপারেশন করলাম। তিনি সিংঙ্গাপুর গিয়ে চেক আপ করালেন। সব ঠিক আছে কিনা। সিংঙ্গাপুরের সার্জনগন আশ্চর্য হলেন এত সুন্দর অপারেশনের জন্য এবং এভাবে ডায়াগনসিস এর জন্য। এরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে।

কোলনের ভিতর ক্যান্সার হয় একটি ছোট পলিপ থেকে। পলিপ হচ্ছে কোলনের ওয়াল থেকে ঝুলে থাকা ছোট একটি আঙ্গুর ফলের মত গোটা। এটি ধীরে ধীরে ক্যান্সারে রূপান্তর হয়। পলিপের কোন উপসর্গ থাকে না। ছোট সাইজের ক্যান্সারের ও কোন উপসর্গ থাকে না। ক্যান্সার বড় সাইজ হলে পায়খানা চলাচল বাধাগ্রস্থ হলে পেট ফুলে ওঠে ও পেটে ব্যথা হয় পায়খানার সাথে আম ও রক্ত যায়। এ অবস্থায় রোগ সনাক্ত করে অপারেশন করলে কাংখিত ফলাফল পাওয়া যায় না কারন ততক্ষনে ক্যান্সার আশে পাশে ও রক্তের ভিতর ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অথচ যখন কোনই সমস্যা নেই তখন যদি আমরা ছোট পলিপ (ক্যান্সারের আগের ষ্টেজ) পাই এবং কোলনস্কপের সাহায্যে কেটে ফেলি তাহলে ভবিষ্যতের ক্যান্সার থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারি।

একটি ফুল কোলনস্কপির চার্জ লন্ডনে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এবং সিঙ্গাপুরে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। সে হিসাবে আমাদের এখানে খরচ সতের ভাগের এক ভাগ।

কাদের কোলনস্কপি করা যাবে নাঃ

প্রস্তুতি সঠিক না হলে, কোলনে তীব্র প্রদাহ হলে (Acute inflamatory bowel disease) ডাইভারটিকুলাইটিস, ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন (তীব্র পেটফুলা), অতিরিক্ত দুর্বল রোগী, অল্পদিন আগে যাদের হার্ট এটাক হয়েছে তাদের কোলনস্কপি করায় বিপদ হতে পারে।

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস
বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ
ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারী (সিংগাপুর)
ইন্টারন্যাশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারী (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান(অবঃ), কলোরেকটাল সার্জারী বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বারঃ ইডেন মাল্টি-কেয়ার হসপিটাল
৭৫৩, সাত মসজিদ রোড (স্টার কাবাব সংলগ্ন) ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭২৬৭০৩১১৬, ০১৭১৫০৮৭৬৬১, ।

পাইলসের অপচিকিৎসা বা হাতুড়ে চিকিৎসা

পায়খানার রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের রোগ হয় যেমনঃ পাইলস, এনাল ফিশার, ফিষ্টুলা, ক্যান্সার ইত্যাদি। এসব রোগে মলদ্বারে ব্যথা হয়, রক্ত যায়, চুলকানি হয় আবার ফুলে যায় এবং কখনো কখনো পূঁজ পড়ে, এ জাতীয় প্রতিটি রোগের বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে। বেশীরভাগ রোগ শুরুতে আসলে ঔষধ পত্রের মাধ্যমে ভাল হওয়া সম্ভব। যেমন আমি বিগত বিশ বৎসরে প্রায় দুইলক্ষ লোকের কোলন ও মলদ্বারের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় দেখেছি যে শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ রোগী ঔষধে ভাল হয়েছেন। একশত জনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনের অপারেশন প্রয়োজন। আমি যেহেতু বিশ বৎসর যাবৎ শুধু মাত্র পাইলস, ফিষ্টুলা, ফিশার,কোষ্ঠকাঠিন্য, আইবিএস, আমাশয় ও ক্যান্সারের চিকিৎসা করছি ফলে দেখেছি যে, বিশ বৎসর যাবত যাদের অপারেশন করেছি তার শতকরা ৯৫-৯৭ ভাগ রোগী ভাল হয়েছেন।

পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই তথাকথিত চিকিৎসক নামধারী কিছু ব্যক্তি নিজেকে পাইলস বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করে কোনরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশুনা ব্যতিরেকে চিকিৎসা করে আসছেন। তারা শহরের নামকরা বাসস্ট্যান্ড ও রেলষ্টেশনের কাছে চেম্বার সাজিয়ে যে জাতীয় অপচিকিৎসা করছেন তার হাজার হাজার ভুক্তভোগী প্রতিদিন প্রতারণার শিকার হয়ে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে প্রতিকারের জন্য হাজির হন। তারা এ চিকিৎসার জন্য নাইট্রিক এসিড জাতীয় বিষাক্ত কেমিক্যাল ইনজেকশান ও পাউডার হিসাবে মলদ্বারে ব্যবহার করেন। ফলে মলদ্বারের মাংশপেশীতে পচন ধরে এবং তীব্র ব্যথা যন্ত্রনা ও দুর্গন্ধ তৈরী করে।

রোগীদেরকে প্রথম প্রলুব্ধ করা হয় বিনা অপারেশনে চিকিৎসা হবে এই বলে। এরপর যখন বিষাক্ত কেমিক্যাল প্রয়োগ করার পর তীব্র ব্যাথা ও যন্ত্রনা শুরু হয় তখন উপশমের জন্য অতিরিক্ত মাত্রার বিভিন্ন ধরনের ব্যথা নাশক ইনজেকশন দিতে থাকেন। অনেক রোগী বলেন যে স্যার আমি কয়েকদিন ব্যথায় অনবরত চিৎকার করেছি এবং জোরে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে মলদ্বারে বাতাস দিয়েছি ব্যথা লাঘবের জন্য।

বিশ বৎসর যাবৎ আমি এরূপ অপচিকিৎসার অসংখ্য রোগী দেখেছি এবং এখনো প্রতিদিন দেখছি। সম্প্রতি এরুপ অপচিকিৎসার শিকার একজন মহিলা রোগী এসেছেন যার স্বামী মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন। তিনি এসেছেন পায়খানার রাস্তা সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পায়খানার রাস্ড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নোয়াখালীতে একটি হাসপাতালে তাকে পেটে অপারেশন করে মলত্যাগের ব্যাগ (Colostomy) লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম তার পায়খানার রাস্তা সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং পেটে ব্যাগ লাগানো আছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে তার পায়খানার রাস্তা নতুন করে বানাবো। পরে বিশেষ পদ্ধতিতে অপারেশন করে তার মলদ্বার আবার

(Reconstruction) পূণর্গঠন করি। তার মলদ্বার যখন সঠিক ভাবে কাজ করবে তখন আমরা পেটের ব্যাগ (Colostomy) বন্ধ করে দেব। তখন সে আসল মলদ্বার দিয়ে পায়খানা করতে পারবে।

প্রায় বিশ বৎসর আগের কথা। একজন বয়স্ক রোগী আমার কাছে এলেন। বললেন তিনি পায়খানা করতে পারেন না। টয়লেটে বসলে শুধু চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে কোন পায়খানা বের হয় না। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। মলদ্বারে পরীক্ষা করে দেখলাম এটি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সামান্য কলমের মাথা প্রবেশ করে। তিনি সব সময় প্যাম্পারস পরে থাকেন। প্রতিদিন অনেক ঔষধ খেয়ে পায়খানা নরম করেন সেই পায়খানা অনবরত চুইয়ে বের হয়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনার চিকিৎসা কোথায় হয়েছে তিনি বললেন ঢাকার কলাবাগানে।

পরে সেই রোগীকে আমরা পেটে অস্থায়ী ব্যাগ (Colostomy) লাগিয়ে মলদ্বারে Rotation advancement flap নামক প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমে মলদ্বার আবার তৈরী করেছি। এই অস্ত্রপচার সফল হওয়ায় পরবর্তীতে তার পেটের ব্যাগ বন্ধ করে দিয়েছি। এটি ব্যয়বহুল এবং জটিল একটি প্রক্রিয়া।

আমরা প্রায় প্রতিদিনই অপচিকিৎসার ভুক্তভোগী রোগীদের দেখি। রোগীদের যখন জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে কেন গেলেন। তখন তারা বলেন যে ঢাকা শহরে এত সুন্দর সাইন বোর্ড দিয়ে ওরা চিকিৎসা করছে আমরা বুঝতে পারিনি যে তারা হাতুড়ে ডাক্তার।
ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন রোগী পেয়েছি যারা এই অপচিকিৎসার কারনে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়েছেন। অনেকের শরীরের বিভিন্ন অংশ অবশ হয়েছে বলে জানান। এ চিকিৎসায় যে বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় তাতে স্নায়ু দৌর্বল্য দেখা দেয়া Neurotoxin এর কারনে।
আমাদের মাত্র একটি মলদ্বার আছে। এটিও আবার ছোট সরু একটি পথ। এ পথের আশে পাশের মাংশ বিনষ্ট হলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তক্ষরন হয় এবং মাংসপেশীতে পচন ধরে (Gangrene) এবং পরে শুকিয়ে যাওয়ার পর মলদ্বার ভীষন সরু হয়ে যায়।
আজকাল দেশে যথেষ্ট শিক্ষিত ডিগ্রীধারী চিকিৎসক আছেন। জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে।
আমি সম্মানিত রোগীদের অনুরোধ করব যেন তারা এই সমস্ত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে অকালে নিজের জন্য বিপদ বয়ে আনবেন না।

অধ্যাপক ডাঃ একেএম ফজলুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস
বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ
ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারী (সিংগাপুর)
ইন্টারন্যাশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারী (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, কলোরেকটাল সার্জারী বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বারঃ জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
৫৫, সাত মসজিদ রোড (জিগাতলা বাস ষ্টান্ড সংলগ্ন) ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭২৬৭০৩১১৬, ০১৭১৫০৮৭৬৬১, ।